ব্যাবিলন কথকতা

১৯ তম সংখ্যা

১৯ ডিসেম্বর ২০২৪

BABYLON

BABYLON

ব্যাবিলন এগ্রিবিজনেস

কৃষির সাথে কৃষকের পাশে

ডিসেম্বর ১৯, ২০২৪

সম্পাদক
এসএম এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক
রুমানা আক্তার

বিশেষ সহযোগিতা
আরিফ হোসেন
সুবন পাথাং

প্রচ্ছদ
মাহবুব শিপু

অলংকরণ
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার
সহযোগিতা নিয়ে করা

সার্বিক শিল্প নির্দেশনা
এসএম এমদাদুল ইসলাম
রুমানা আক্তার

সহযোগিতা
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
১৫/বি মিরপুর রোড,
০১৭০৫-০৬৭০৯২

BABYLON

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী			৩
সম্পাদকীয়			৪
কাপ্পুর কথা	:	এসএম এমদাদুল ইসলাম	৮
গোধূলি বিকেল বেলা	:	মো. রাশেদুল ইসলাম রাশেদ	১৬
বিরহ বিষাদ	:	মো. সাইফুল ইসলাম	২১
আমারে দিবোনা ভুলিতে	:	আয়েশা সিদ্দিকা আরজু	২২
অভিযোগ	:	মো. রফিকুল ইসলাম	২৪
ক্যাথিড্রাল	:	এস এম আরিফ রাজ্জাক	২৫
অন্তরালে	:	রুমানা আক্তার	৪১
হারিয়ে যাওয়া বন্ধু	:	মোছা. লিমা খাতুন	৪৬
হিম বসন্তের সহযাত্রী	:	সুবন পাথাং	৪৯
বন্ধু	:	সাইদুর রহমান	৫৮
হ য ব র ল	:	মো. মজনু মিয়া	৫৯
অ-পে-ক্ষা	:	আশরাফুল আলম	৬০
জীবনে প্রত্যক্ষ উত্থানপতনের কিছু গল্প ও তার বিশ্লেষণ	:	মুহাম্মদ সাইফুল হক	৬১
১২০ বাই ৮০	:	ডা. মো. দিদারুল করিম	৬৪
নারীর পরিচয় বৈষম্য	:	তিথি মজুমদার তৃণা	৬৮
‘স্মৃতিসৌধ থেকে মাজার’– এক সন্ধ্যার ডায়েরি	:	আরিফ হোসেন	৭১
শীত স্মৃতি	:	ইথার আখতারুজ্জামান	৭৭
বিরহের কালো মেঘ	:	সৈয়দ মাহাবুব মোর্শেদ	৭৮
আমার মা	:	মোসা. মোবাশ্বেরা আক্তার	৭৯
আমাদের অরণ্যের দিনরাত্রি	:	আরিফ ভূঁইয়া	৮০
মামার মুখে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ	:	লুবাইয়া ইয়াসমিন	৮৫
ফ্রেন্ডস লাইব্রেরি	:	শেখ মৃন্ময় জামান	৮৭
অধরা স্বপ্ন	:	মো. মহসীন	৯০
অধিকার	:	মো. ,.ওমর গাজী প্রামাণিক	১০০
স্বপ্ন	:	মো. আব্দুল মোত্তালিব	১০১
জীবনের ধাঁধাঁ	:	আম্বিয়া	১০১
বিভীষিকাময় দিনগুলো	:	উম্মে সালমা ডালিয়া	১০২
স্বপ্নের শহরে জীবন-জীবিকার গল্প	:	মাকসুদা খাতুন	১০৭
চাও ফ্রায়ার ফিসফিস	:	মো. শাহজালাল মিয়া পলাশ	১১০
নিরন্তর চাওয়া	:	মো. গোলাম মাওলা	১১৫
জীবনযুদ্ধে বিজয়িনী	:	বদিউল আলম	১১৬
ফটো অ্যালবাম			১১৭-১১৯

শুভেচ্ছা বাণী

মাসরুর আরেফিন
কবি, কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও-সিটি ব্যাংক

ব্যাবিলন গ্রুপের এসএম এমদাদুল ইসলাম ভাইয়ের ডাকে তাদের ওখানে একটা সাহিত্য সভায় গিয়েছিলাম কয়েক মাস আগে। উপলক্ষ্য কী ছিল, মনে নেই। তবে যতদূর মনে করতে পারি, বিষয়টা ছিল এই 'ব্যাবিলন কথকতা'-রই কিছু একটা সংশ্লিষ্ট। ওদিকে স্মৃতি নিয়ে বিভ্রান্ত সেই একই আমি কিন্তু ঠিকই মনে করতে পারছি যে, অনুষ্ঠানে এমদাদ ভাই ও অন্যদের মধ্যে কীরকম উৎসাহ-উদ্দীপনাই না সেদিন দেখেছিলাম সাহিত্য বিষয়টাকে কেন্দ্র করে।

ইদানিংকালে, এই মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে, গত সংখ্যার 'ব্যাবিলন কথকতা' ঠিক মতো বুঝে নেবার কাজে নেমে, আমি তো বিস্মিত।

কোম্পানির পরিচালক এরকম সাহিত্যরসিক, আবার ম্যাক্রো অর্থনীতিতে দখলওয়ালা মানুষ (তাঁর লেখা গতবারের 'সম্পাদকীয়' পড়ে বলছি); সিওও- ব্যাবিলন ট্রিমস, জেমস জয়েসপ্রেমী একজন কর্মকর্তা; গ্রুপ সিএফও সাব্বির আহমেদ ছোটগল্প লেখক (তাঁর চেখভিয়ান গল্পটা আমাকে ভাবিয়েছে; কেমন মায়া ছড়ানো একটা লেখা!); তাদের সুইং অপারেটর নাছিমা খানম শৈশবের 'রোদপোহানো দিনগুলো'র জন্য তাঁর পদ্যে কাতর; তাদের এইচ আর-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, রুমানা আক্তার এক নারীর আত্মহত্যাকে কী বিষাদ ছড়িয়েই না রূপ দিলেন গল্প ও একই সঙ্গে জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গের বর্ডারলাইনে দাঁড়ানো নিবন্ধ, এ দুই মিডিয়ামের সম্মিলন ঘটিয়ে; আর তাদের সুপারভাইজার- সুইং (অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড), মো: সজল মিয়া যে 'বৃষ্টিকাব্য' লিখেছেন তা পড়ে কেমন আমার মনে পড়ে গেল শহীদ কাদরীর 'বৃষ্টি' কবিতার কথা-সবটা মিলে অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য!

আর কথা না বাড়িয়ে নতুন সংখ্যা 'ব্যাবিলন কথকতা'-র জন্য প্রাণঢালা শুভেচ্ছা রাখলাম, আর অচিন্তনীয় রকমের সাহিত্যপ্রেমী ব্যাবিলন পরিবারের উদ্দেশে-স্যালুট।

*****

সম্পাদকীয়

এসএম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

দেশে দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলছিলো স্বৈরশাসন।

কিন্তু এ বছর ৫ আগস্ট ছাত্রবিপ্লবের অপ্রত্যাশিত সফল পরিণতি হিসেবে জাতি আজ নির্ভয় হয়েছে, একটা দমবন্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছে, স্বাধীন ভাবে শঙ্কাহীন চিত্তে কথা বলতে পারছে এটা এখন মনে হয়। বিগত সরকারের সুদীর্ঘ আমলে হিটলারের গেস্টাপো সংস্থা দিয়ে জার্মান জনগণের দমনের কথা মনে পড়তো সব সময়। নিজ ঘরে বসেও মনখুলে কথা বলতে ভয় পেতো মানুষ, ভাবতো দেওয়ালও বোধহয় শুনে ফেলবে, বুঝি ছুটে আসবে খুনি ও জুলুমবাজ সরকারের বিবেকবর্জিত পুলিশ বাহিনীর কোনও সদস্য গুম বা ক্রসফায়ারে দিয়ে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

দুষ্টরা সব পালিয়ে গেলো – বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করতে একটু সময় লাগলো। কিছু দিন কাটলো একরকম ঘোরের মধ্যে। তারপর শুরু হলো যা হবার তাই। হঠাৎ করে এতোদিন ধরে বুকের মধ্যে পুষে রাখা রাগ, ক্ষোভ, প্রতিশোধের আগুন, বঞ্চনার সকল কষ্ট – সুনামির জোয়ারের মতো সব একসাথে ফুঁসে উঠতে থাকলো। এখন রাতারাতি সব সংস্কার চাই, সকল সমস্যার সমাধান চাই, বিচার চাই, শুধু বিচার না – ন্যায় বিচার চাই, আজ আমরা মুক্তস্বাধীন কাজেই যুক্তির ধার আর ধারবো না – এরকম একটা ভাব যেন এখন সবার মধ্যে। আজই সব চাই অন্তবর্তিকালীন সরকারের কাছ থেকে, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার নাই। বর্তমানের এই তাড়াহুড়ায় গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারওতো এসবের জন্য তৈরি ছিলো না। ফলে তদের পথচলাটাও হচ্ছে শিশুদের মতো টলোমলো, এক পা আগায় তো পরক্ষণে দু পা পিছায়। হুড়মুড় করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আগায় আবার বিকেলে বা পরের দিন সিদ্ধান্ত বদলায়। ফলে খুব দ্রুত জনগণের আস্থা হারাচ্ছে অন্তবর্তীকালীন সরকার।

পরিবর্তনের পরে মনে হয়েছিলো ইউনূস সাহেব দেশের হাল ধরায় প্রচুর ভাগ্য খুলে যাবে আমাদের দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরে। সেটা যদি কখনও হয়ও তো এই মুহূর্তে দেশ তাঁর অধীনে যেভাবে চলছে তাতে সেরকম কোনও আভাস দেখি না। মনে হয় সেরকম ভালো কিছু হতে আরেকটা ছোটো আকারের অলৌকিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। দেশের বাজারে

জিনিসপত্রের দাম ভীষণ ভাবে বেড়েছে, যেখানে চাঁদাবাজি কমেছে মনে করে এর উল্টোটাই আমরা আশা করেছিলাম। দিনে দিনে চাঁদাবাজি সমাজের বা প্রশাসনের সর্বস্তরে জেঁকে বসেছিলো। রাতারাতি তার পরিবর্তন হবে না সেটা খুব বুঝতাম। অন্তত আমাদের গার্মেন্ট সেক্টরে চাঁদাবাজি কমেনি, বন্ধ হওয়াতো দূরের কথা – তা আমরা জানি। মাত্র ক'মাস আগে পাঁচ বছরের জন্য গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ঘটলো অভাবনীয় মাত্রায়। কিন্তু তার পরেও বর্তমান অবস্থার ঘোলাপানিতে মৎস্য শিকারীরা এই ক্ষেত্রে আবার মাঠে নেমেছে। ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকছে, রপ্তানি বিঘ্নিত হচ্ছে। বায়ারদের ভয় ধরে যাচ্ছে। তারা বিকল্প ব্যবস্থায় যেতে বাধ্য হচ্ছে।

দেশে বর্তমান সরকারের প্রত্যাশিত রাজনৈতিক দলটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসতে পারেনি। ফলে এ নিয়ে বেশ একটা জল্পনা কল্পনা বাজারজাত হচ্ছে। ইউনূস সরকারের দিন শেষ, পালিয়ে যাওয়া জনপরিত্যক্ত ও নিন্দিত নেতার ও তার দলের প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবার – এই সব কথা বাজারে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশটার দুর্ভাগ্য ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে নিহিত আছে বলে আমার মনে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শোষক শাসকের হাত থেকে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে স্বাধীন করতে পারিনি। প্রতিবেশী দেশের সামরিক ও অন্যান্য সহায়তা আমাদের লেগেছে, নিতে হয়েছে। আর এর ষোলো আনা উসুল উঠিয়ে নিতে সেই দেশটির কোনও সমস্যা তারপর থেকে হয়নি। এ দেশে তাদের কুশিলবরা বেশিরভাগ সময় তাদের অন্যায্য সহায়তা নিয়ে দেশের ক্ষমতায় থেকেছে। এর পর থেকে দুর্বল ও ভঙ্গুর মেরুদণ্ড নিয়ে জন্ম নেওয়া রাষ্ট্রটি যেন আর কখনোই নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না বা দাঁড়ানো যে সম্ভব সেটাই যেন রাষ্ট্রটি শেখেনি। পরদেশ বা পরশক্তি নির্ভরশীলতা আমাদের বড্ডো বদঅভ্যাসে পরিণত হয়েছে, গা সওয়া হয়ে গেছে। কারও না কারও সাহয্যে বা আশ্রয়-প্রশ্রয়ে আমাদের থাকতে হবে এটাই আমাদের জন্য বিধান – এমনটাই আমরা বিশ্বাস করি ও মানি।

যা হোক, এখন পরনির্ভরশীলতা ঝেড়ে ফেলে দেশ সর্বক্ষেত্রে সক্ষম পদক্ষেপে হাঁটুক, হোক ধীর পায়ে, কিন্তু সেটা যাতে হয় দৃঢ় ও স্থিতিশীল পায়ে।

গত সাত আট মাস ধরে ব্যাবিলনের চলার ধরনের সাথে আমি কেন যেন বর্তমানে দেশ চলার হালের একটা মিল খুঁজে পাচ্ছি। ব্যাবিলনের কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার আজ দশটি বছর শেষ হতে চলেছে। কিন্তু একটা সঠিক, যোগ্য ও মজবুত ব্যবস্থাপনা দলটা যেন ঠিক জমতে পারছে না। বিশেষ করে এবছর এর অভাব আমার কাছে বেশি করে প্রকট হয়েছে। ব্যাবিলন নামের এক সৌরজগতের সূর্যকে লক্ষ্য ও কেন্দ্র করে সবাই চলছে এমনটা

দেখলে ও তা বিশ্বাস করতে পারলে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু দেখে মনে হয় সবারই যেন আলাদা কক্ষপথ ও ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে। একটা প্ল্যানেটারি সিস্টেমের যে শৃঙ্খলাপূর্ণ পথচলা থাকে সেটা আমাদের যেন নেই। দেশে এখন সবাই নেতা। সবাই প্রফেসর ইউনূস। ব্যাবিলনেও কি তারই এক অপচ্ছায়া দেখতে পাই? আশা করি তা নয়। কোনও দুর্বল মুহূর্তে সেটা যদি আমার মনের আকাশ অতিক্রম করেও থাকে তো সেটা যেন হয় আমার ভুল কল্পনা বা শঙ্কা, আমার অতিকল্পনা। তা হলেই ভালো।

জানি আমার কথায় নৈরাশ্য আছে। সবাই মনে করে আমি অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারি না। কিন্তু আমাদের জন্য অল্প ও যথেষ্টর ভেদরেখাটা কোথায়? সিইও সহ সবাই মিলে আমার নৈরাশ্য ও আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করুক সেইটাইতো চাই। আমার শঙ্কা ভুল প্রমাণিত হলেই আমি খুশি। প্রায় ১৪,০০০ কর্মী ও কর্মচারী ব্যাবিলনের মাধ্যমে তাদের রুজি নিশ্চিত করছেন। এ অবস্থায় ব্যাবিলনের অস্তিত্ব রক্ষা ও গ্রুপটিকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাবার কোনও বিকল্প নেই। কতো মানুষের, শুধু সাধারণ রোজগার নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্নও এর সাথে জড়িত হয়ে আছে।

দেশের পরিস্থিতি, ব্যাবসায়ের সার্বিক পরিস্থিতি ও নিজেদের ব্যাবসায়িক চ্যালেঞ্জ নিয়ে হিমসিম খেতে খেতেও পত্রিকাটি বের করা গেলো। আগের যে কোনও বারের চাইতে এবারে এটার প্রকাশনা বেশি সমস্যাসংকুল ছিলো। রুমানা ও তার সাথে নিবেদিত কিছু প্রাণ এবারেও সক্ষম হলো। যে ধকল রুমানাদের উপর দিয়ে যায় তাতে হয়তো প্রতিবার এইসময়টায় ওরা ভাবে সামনে আর নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকতে ওরা পারে না। রুমানার এক সহকর্মী সুবন বেশ করিৎকর্মা হয়ে উঠেছে। এতে করে অবশ্য সহকারী সম্পাদকের কাজ কিছুটা হলেও সহনীয় হচ্ছে। এই সুবন অবশ্য রুমানারই হাতে গড়া। এবারের সংখ্যায় কিন্তু একটা চোখে পড়ার মতো বা মনে ধরার মতো চমক আছে। পাঠক-পাঠিকা কি সেটা ধরতে পেরেছেন? এ নিয়ে আপনাদের কাছ থেকে পরে শুনবো।

এবারের সংখ্যায় প্রথম পাতায় বা গতসংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আগত প্রধান অতিথির পাতায় জনাব মাসরুর আরেফিন সাহেবের বক্তব্য বেশ দেরিতে (সত্যি বলতে যেই মুহূর্তে ওটি পাবো না বিশ্বাস করে সেই জায়গাটা অন্যত্র বিলি করে দিয়েছি সেই সময় তাঁর কাছ থেকে বক্তব্যটি লিখিত ভাবে পেয়েছি) আসায় শেষ মুহূর্তে সেই বক্তব্যকে ছেঁটে একটু ছোটো করে দিতে আমি বাধ্যই হয়েছি। তাঁর অনুমতি বা সম্মতি কোনওটাই নিতে পারিনি। সেজন্য এই কলামে আমি জনাব মা. আ. এর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

শেষ করবার আগে এবারে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের কোটাবিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে প্রথম শহীদ আবু সাঈদের কথা একটু বলতেই হয়। আমাদের কী সৌভাগ্য যে সে ছিলো ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের অধীনে বৃত্তি পাওয়া একজন কৃতী ছাত্র। আজ ওর আত্মাহুতি আমাদেরকে একই সাথে করেছে গর্বিত ও চিরদুখী। আমাদের একটা সান্ত্বনার জায়গা অবশ্য আছে। ব্যাবিলনের পক্ষ থেকে কোটাবিরোধী ছাত্র বিক্ষোভে তৎকালীন সরকারের ঘৃণ্য বাহিনীর হাতে অসংখ্য আহতদের মধ্য থেকে কিছু মানুষের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে চিকিৎসার জন্য কিছু আমরা করতে পেরেছি, এখনও করছি। আমি জানি এ বিষয়ে অহঙ্কার করার কিছু নেই, কারণ দেশের অনেকেই এটা করেছেন বা বেশি করেছেন আমাদের চাইতে। কিন্তু আমরা পেছনে পড়ে থাকিনি এই উদ্যোগের, বা অনুপস্থিত থাকিনি, সেটাই আমার আনন্দ।

আরেকটা কাজে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করতে পেরে আমাদের একটা ভালোলাগা তৈরি হয়ে আছে। সেটা হলো বিগত ছাত্রআন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটবার অল্প পরপর দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বা কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর এসব অঞ্চলে রেকর্ড বন্যা নেমে আসার পরে সেইসব এলাকার দুর্গত মানুষের জন্য কিছু করতে পারা। আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্স লিমিটেড। এদের কাজকর্ম দেশ জুড়ে বিস্তৃত। ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্স কোম্পানির কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের কর্মীদের সাহায্য নিয়ে আমরা কিছু তাৎক্ষণিক ত্রাণ তৎপরতা ও পরে ভুক্তভোগীদের জন্য তাদের পুনর্বাসন কল্পে কিছু করা গেছে। কিছু বাড়িঘর বানিয়ে দেওয়া, গবাদিপশু কিনে দেওয়ার মতো কিছু কাজ করতে পেরেছি আমরা।

ব্যাবিলন পরিবারে এ বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নতুন মুখ এসেছে, কিছু পুরোনো মুখ বিদায়ও নিয়েছে। আশা করি ভাঙাগড়ার এই চিরন্তন খেলায় সকল সময়ে ব্যাবিলনের দলে নতুন মেধা ও অভিজ্ঞতা যুক্ত হবে ও তা পুরোনো ও নতুনদের সমন্বয়ে একটি দলে পরিণত হয়ে ব্যাবিলনকে বিভিন্ন ভাবে সমৃদ্ধ করবে। আমাদের দশ বছরে লক্ষ্যার্জনে বেশ পিছিয়ে আছি আমরা। এখন লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে কতোটা বাড়তি গতি আমরা ব্যক্তিগত ও দলোগত ভাবে অর্জন করতে পারি সেইটেই দেখার।

ব্যাবিলন পরিবারের সবাইকে ধন্যবাদ (প্রাক্তন ব্যাবিলনিয়ানরাও এর অন্তর্গত)। ধন্যবাদ আমাদের সুখদুখের সাথি সকল ক্রেতাসাধারণকে, সরবরাহকারীদেরকে।

ব্যাবিলন গুণে ও মানে সমৃদ্ধ হতে থাকুক নিরন্তর।

সকলকে দরজায় টক টক করতে থাকা ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

*****

কাপ্পুর কথা

এসএম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

সে সময়ে কাপ্পু কারো নাম হতে পারতো এটা ভাবতে নিশ্চয় অবাকই লাগছে আপনাদের, তাই না? ছিলো কিন্তু। আমার বয়স যখন বছর আটেক তখনকার কথা। কাপ্পু তখন দশ। আজকাল ছোটোরা বড়োদের নাম ধরে ডাকে, এটা কানে তেমন কটু লাগে না। কিন্তু সে সময়ে আমরা তা করতে পারতাম না, করতাম না। তবুও – কাপ্পুপা! কেমন লাগতো শুনতে? মোটেও ভালো লাগতো না – না বলতে, না শুনতে। কাপ্পু আপা – উচ্চারণে কষ্ট। আমি কাপ্পুই বলতাম, ডাকতামও ওই নাম ধরেই। না, শুনতে ভালো লাগতো না, বা কষ্টকর উচ্চারণ, সে জন্য না। আসলে কাপ্পুকে পছন্দ-ই করতাম না আমি। ওকে আসলে ঘেন্নাই করতাম। ইংরেজিতে যেটাকে বলে হেইট। ওকে হেইট করতাম। কেন জানেন? কারণ ও-ও আমাকে হেইট করতো।

পাড়ার খেলার সাথি সবগুলো ছেলে-মেয়ে বলতে গেলে আমার থেকে বয়সে বেশি ছিল। কেউ কাপ্পুর বয়সি, কেউ বা আরেকটু বেশি। কিন্তু সবার সাথে আমার চমৎকার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কাপ্পুর সাথে তা ছিলো না। তখনকার দিনে বাচ্চা ছেলেরাও সমবয়সি বা কাছাকাছি বয়সি মেয়েদের দিকে সেরকম ভালোকরে তাকাতো না। এটাই ছিলো রেওয়াজ। কোনো বালিকা বা তরুণী দেখতে সুন্দর বা সুন্দরী- এই বিষয়গুলি মূখ্যই ছিলো না ছোটোদের মধ্যে (এ কথাগুলো আমার নিজের অভিজ্ঞতা প্রসূত)। তবু বলতে পারি, কাপ্পু দেখতে ভালো ছিলো। তখনকার দিনের দস্তর অনুযায়ী দীর্ঘ চুল মাথায়। চক চক করতো প্রায় কোমরঅব্দি লম্বা কালো চুল, তেলতো দিতোই চুলে। গায়ের রং? উজ্জ্বল শ্যামলাই বোধ হয় ছিলো। ভালো মনে নেই আর আজ। গলার আওয়াজও হয়তো মিষ্টি ছিলো, কিন্তু তা আমার জন্য নয়। আমাকে কাপ্পু দু'চোখে দেখতে পারতো না। কেন যে পারতো না!

আসলে কারণটা আমি জানতাম। কাপ্পু ছিলো সেরকম একটা মেয়ে যে কিনা অন্য সবার উপর আধিপত্য ফলাবে – বিশেষ করে ছেলেদের উপর। বয়সে আমার থেকে বড়ো হলেও আমি ওকে একটুও মানতে চাইতাম না, ওর কথা শুনতাম না। তারপরও অন্যসব ছেলেদের তুলনায় আমি বোধকরি সহজে বাধ্য ছিলাম।

সেসব দিনে প্রায় প্রতিটা বাড়ির পেছন দিকটায় গাছগাছালি ভরা জায়গা থাকতো। আমাদের বাসার পেছন দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা খালের পাড় পর্যন্ত ওরকম বেশ একটা খোলা জায়গা ছিলো বড়ো বড়ো কিছু আম কাঁঠাল গাছ নিয়ে। ওখানে বনভোজন হতো। কখনো শুধু বড়োরা, কখনো বড়ো ছোটো মিলে আবার কখনো শুধু আমরা ছোটোরা। আমাদের বাচ্চা ছেলেদের কাজ ছিলো বন-বাদার থেকে শুকনো ডাল-পাতা কুড়িয়ে আনা। সে সবতো আনতামই, কিন্তু এতে কাপ্পুর মন ভরতো না। আমাকে চুলোর আগুন ধরানোর কাজ, সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়ানোর কাজ – এসব দিতো। আমি যদিও ওসব হুকুম মানতাম না ওর। বনভোজন ছাড়াও আমাকে নানান ফাইফরমাস করতো। বলতো – যা তো, দোকান থেকে একটা খাতা কিনে নিয়ে আয়তো আমার জন্য, বা পেন্সিল। বাজার থেকে তেঁতুল, চালতা এ সবও কিনে আনতে বলতো। কাপ্পুদের বাড়িতে দু-দুটো কাজের ছেলে থাকতেও, বা আমার বয়সি ওর এক ভাই খোকন থাকতেও আমাকেই ও বলতো। আমি বুঝতাম না কেন আমার সাথে ওর এই আচরণ। ওকে পছন্দ করতাম না বলেই কি আমাকে খাটাতে চাইতো বাড়ির কাজের ছেলেদের মতো, না ওর কথা শুনতাম না বলেই আমাকে ওর এতো অপছন্দ। একদিনতো আমাকে ও প্রায় মেরেই ফেলেছিলো। ওদের বাসায় সদ্য বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। ওই সময়ে এক দিন ওদের বাসায় গিয়ে খোকনের সাথে খেলছিলাম। খেলছিলাম বললে ভুল হবে, আসলে খোকনের মার্বেলের বিপুল সংগ্রহ দেখছিলাম। কত বিচিত্র সেগুলোর রং, ডিজাইন! লাল, নীল, বেগুনি, হলুদ, কমলা, সবুজ, ডোরাকাটা। কতগুলো আবার একরঙা – যা এর আগে আমি দেখিনি। ওসব দেখতে দেখতে লোভ ও উত্তেজনায় চোখ দুটো আমার বেশ চকচকে হয়ে উঠেছিলো নিশ্চয়। মার্বেলগুলো ছুঁয়ে দেখছি, মুঠো ভরে নিয়ে পরখ করছি। আমার নিজের মার্বেলের সংখ্যা অনেক কম, আর সেগুলো এত রকমারিও নয়। স্বাভাবিক ভাবেই খোকনকে আমার দারুণ হিংসে হচ্ছিলোও। ওই সময় কাপ্পু কোথা থেকে দুরদার করে এসে ঘরে ঢুকলো। এসেই কিছুক্ষণের জন্য রান্নাঘরে চলে গেলো ও একটু পরে ওখান থেকে বেরিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

- এই, কী করছিস তোরা? পড়ার সময় মার্বেল নিয়ে বসেছিস, এক চড় খাবি। খোকনও ওর বড়োবোন কাপ্পুকে একটু ভয় পেতো। ও আমার হাত থেকে মার্বেলগুলো নিয়ে নিলো, তারপর সেগুলো তার বাক্সে ভরে রাখলো সযত্নে। কাপ্পুকে ঘরে ঢুকতে দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিলো আমার। পরে ওর মাতুব্বরি মারা কথা শুনে পিত্তি জ্বলে গেলো। কিছু না বলে আমি বেরিয়ে আসতে গেলাম। ওই সময় কাপ্পু আমাকে ডেকে বসলো।

- এই গুড্ডু, এদিকে আয়, তোকে একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি। আমার নাম কিন্তু মোটেও গুড্ডু নয়, রেদওয়ান। সেটাকেই কাপ্পু গুড্ডু বানিয়ে দিয়েছে। রেদওয়ানকে গুড্ডু, কিসের মধ্যে কী! দুঃখের কথা ওর দেখাদেখি লক্ষ্মী মেয়ে কমলা, শেফালি, রাণু, – এরাও আমাকে এখন ওই নামেই ডাকে। বুঝতেই পারছেন এই কাপ্পুটাকে হেইট করার এক হাজার কারণ ছিলো আমার। তবে ওর অনেক আদেশ অমান্য করলেও ওকে গাপ্পু ডাকার সাহস আমার ছিলো না। সত্যি কথা বলতে কী দু'একবার আমাকে চড়-থাপ্পড়ও দিয়েছে মেয়েটা। অবশ্য শুধু আমাকে না, ওর ভাই খোকনকেও। তা, ওর ভাইকে ও মারতে পারে, কিন্তু আমাকে কেন? আমিতো আর ওর ভাই নই। কিন্তু এ কথা ওকে কে বোঝায়!

ওর আজকের ডাকে কোনো ঝাঁঝ না থাকায় আমি কিঞ্চিত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। কাপ্পু আবার মজার কী দেখাবে? ও ওদের বসার ঘরের টিনের বেড়ার একটা কাঠের থামের কাছে টেনে নিয়ে গেলো আমাকে। তারপর ড্রেসিং টেবিলের উপর পড়ে থাকা খালাম্মার (ওদের মা) সোয়েটার বোনার একটা উলের কাঁটা মস্ত এক উলসুতোর বল থেকে খুলে নিয়ে এলো। কাঁটাটা আমার হাতে দিয়ে বললো –

– এই যে কালো জিনিসটা দেখছিস, এর এই ফুঁটোটার মধ্যে কাঁটাটা ঢুকিয়ে দ্যাখ কী মজা হয়। পাঠক-পাঠিকা, আপনারা ঠিকই বুঝেছেন। ওটা ছিলো ওদের বাড়িতে লাগা বিদ্যুৎ লাইনের উপরে লাগানো একটা সকেট – প্লাগ লাগাবার জন্য। এর আগে পর্যন্ত বিদ্যুতের কোনো ধারণাই আমার ছিলো না। কাজেই কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা ছাড়াই আমি কাপ্পুর কথা বিশ্বাস করে উল বোনার কাঁটাটা একটা ছিদ্রের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। এরপর আমার অবস্থা কীরকম হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। ঝনঝন করে উঠেছিলো পুরো ডান হাতটা। এক ঝটকায় ছিট্‌কে পড়ে গিয়েছিলাম কাঠের পাটাতনওয়ালা মেঝের উপর (ওই সময়ে কোনো কোনো বাড়ির মেঝে মাটি থেকে উঁচু করে কাঠে তৈরি হতো)। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বোধহয় জ্ঞান-ও হারিয়েছিলাম আমি। সম্বিত ফিরে এলে দেখি কাপ্পু ঘরে নেই। থাকার কথাও নয়, ও অতো বোকা মেয়ে ছিলো না মোটেই। আমার খেলার সাথি ও বন্ধু খোকন আমার মাথায় পানি ঢালছে তখন।

একটা কথা মনে পড়ে গেলো – কাপ্পুকে একবার তার বান্ধবীদের সামনে লজ্জায় ফেলেছিলাম। আমার ধারণা তারপর থেকেই ও একটু বেশি আমার পিছনে লেগে থাকে – আমাকে শিক্ষা দিতে চায়। একবার সবাই মিলে আমার মা, কাপ্পুর মা, ও কারো কারো বড়ো বোন সহ আমরা ক'জন ছেলে খেলার সাথি মিলে অদূরে ডি. এম. (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) এর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। ডি. এম. সাহেবের এক ছোটো বোন আবার ছিলো রাশেদা

খালার বান্ধবী। ওই সুবাদে সামনে বিশাল মাঠ ও পেছনে বিশাল পুকুরওয়ালা ওই বাড়িতে মাঝে-মধ্যে আমাদের বেড়াবার সুযোগ হতো। ওই ডি. এম. -রা খরগোশ পুষতো। ওগুলো বেশ নির্ভয়ে আমাদের সামনে ও পেছন দিয়ে ছুটে বেড়াতো, ঘাস ছিঁড়ে খেতো, মাঝে মাঝে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমাদের দেখতো কৌতূহলী চোখ মেলে। সেদিন শেফালি দুম করে কাপ্পুকে জিজ্ঞেস করে বসলো, আচ্ছা বলতো খরগোশ ইংরেজি কী? আমি তখন ওদের কাছেই ছিলাম। দেখলাম কাপ্পুর চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে, তার মানে ইংরেজিটা জানে না বা মনে করতে পারছে না সে। কী যে সেদিন আমার হয়েছিলো কে জানে, চট করে বলে বসলাম, খরগোশ ইংরেজি হেয়ার এটাও তুমি জানো না, কাপ্পু? তুমি না অনেক উপরের ক্লাসে পড়ো? জানো তোমার সামনের দাঁত দুটো দেখতে ঠিক খরগোশের মতো। ব্যস! শেষের খোঁচাটা যে নির্মম ও বর্বরদের মতো হয়ে গিয়েছিলো সেটা বোঝার মতো বয়স বা বুদ্ধি কোনোটাই আমার তখন ছিলো না। কাজেই ওই দিনই বোধহয় আমি কাপ্পুকে আমার জানের দুশমন বানিয়ে ফেলেছিলাম।

ওই ঘটনার পর থেকে কাপ্পু আমার সাথে বেশ কিছুদিন কথা বলেনি, আমিও ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থেকেছি। দুজনই যখন ঘটনাটা ভুলে গেছি তখন একদিন স্কুলছুটির দিনে কাপ্পু আমাকে ডেকে নিলো। বললো, চল্ তোকে একটা জিনিস দেখাবো। কাপ্পু কী দেখাবে তাতে আমার কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল হলো না, কিন্তু ওর ডাক উপেক্ষা করারও উপায় নেই। ও আমাকে ওদের বাড়ির পেছনে একটা জায়গায় এক রকম হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো। একটু দূরে খালের পারে আঙুল তুলে আমাকে কিছু একটা দেখিয়ে বললো, দ্যাখ উই পোকার পাহাড়। সুন্দর না? – হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি আমিও। সত্যিই সুন্দর দেখতে ছোটো বড়ো নানান উচ্চতার মাটির ঢিপি। কোনোটার রং শুকিয়ে সাদাটে, কোনোটা এখনো কাঁচা। দেখতে দারুণ! কেমন বুটি বুটি জমানো মাটি উঁচু হয়ে ফুলে ফুলে আছে।

-কাপ্পু? উইপোকার ঢিপি এমন হয়?

- ও মা, এমন হয় না তো কেমন হয়? যা না, কাছে গিয়ে ধরে দ্যাখ, হাতে মজার সুরসুরি পাবি।

সুরসুরির জন্য না, আমি ভাবছি তখন অন্য কথা। এমন সুন্দর মাটি, এ দিয়ে নিশ্চয় সাংঘাতিক সব গুললি বানানো যাবে আমার গুলতির জন্য। কাদামাটির মার্বেল মতো বানিয়ে রাতে মাটির চুলার অঙ্গারের ভিতরে গুঁজে রাখতাম, আর সকালের মধ্যে সেগুলো ইটের মতো শক্ত হয়ে যেতো। ওই দিয়ে চড়াই, শালিক মারা বা ওগুলোকে তাক করা ছিলো আমাদের ছেলেদের অন্যতম এক মজার খেলা। আমার মনে হলো এই উই পোকার তোলা

মাটির গুললি অনেক কড়া জিনিস হবে। কাজেই সাগ্রহে ঢিপির সামনে চলে এলাম আমি।

- আমি গেলাম রে, গুড্ডু। বলে কাপ্পু চলে গেলো। আমি ভাবলাম জীবনে এই প্রথম কাপ্পু আমার সাথে নিঃস্বার্থ একটা ভালো ব্যবহার করলো। কাপ্পুর উদ্দেশে একটু মাথা নেড়ে আমি উই ঢিপিটার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে কোন্ পাহাড়টা আগে ভাঙবো সেই সিদ্ধান্ত করতে লাগলাম। এই সময় আমার উন্মুক্ত উরুর এক জায়গায় পিঁপড়ের কামড় অনুভব করলাম। বেশ কঠিন কামড়। আহ্ করে উঠে হাতের চেটো দিয়ে ডলতে লাগলাম জায়গাটা। কিন্তু ততক্ষণে এখানে ওখানে একসাথে আরো অনেক কামড়। তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে উঠলাম আমি। লাল আগুন পিঁপড়ার বাসা এগুলো। উই টুই সব মিথ্যা। আমি পাগলের মতো নাচতে লাগলাম, আর ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে লাগলাম। সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে যেন আমার। এরপর কী হয়েছিলো আমার আর মনে নেই। জ্ঞান ফিরেছে আমার সদর হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগে। কাপ্পু নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়েছে সবার সামনে ওকে অপমান করার। ও কিছুই ভোলে না।

এই ঘটনার মাস খানেক পরে আমি একটা সুযোগ পেলাম কাপ্পুর উপর একটা বদলা নেবার। যে ভোগান্তি কাপ্পু আমাকে দিয়েছে তার তুলনায় সুযোগটা কিছুই না, কিন্তু কিছু একটা অন্তত করার সুযোগ আমি হাতছাড়া করলাম না। আগেই বলেছি কাপ্পু মাঝে মধ্যে ওর ছোটোখাটো কেনাকাটা করাতে চাইতো আমাকে দিয়ে। সেরকম, একদিন দুটো এক্সারসাইজ খাতা আর একটা পেন্সিল কিনে এনে দিতে বললো আমাকে। এক মুহূর্ত চিন্তা করেই রাজি হয়ে গেলাম আমি।

- দাও, পয়সা দাও। এনে দিচ্ছি।

কাপ্পু একটু অবাক হলো বেশ বুঝতে পারলাম। স্বভাবতই ও ভেবেছিলো আমি রাজি হবো না। ও আমার দিকে একটু অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে পরে ঘরে গিয়ে পয়সা নিয়ে এলো। তখনকার দিনে দু'আনায় একটা খাতা, আর এক আনায় একটা পেন্সিল মিলতো। আমি যথারীতি খাতা-পেন্সিল কিনে আনলাম, তারপর সরাসরি কাপ্পুদের বাসায় না গিয়ে নিজেদের বাসায় চলে এলাম। মা গেছেন পাশের বাসার খালাম্মার সাথে গল্প করতে। আমার ছোটো ভাইটাকে গল্প করে খাওয়াচ্ছে বাসার কাজের মেয়ে, দশ এগারো বছরের ছবি। (মজার না? অতো কাল আগে বাসার কাজের মেয়ের নাম ছবি। আসলে ওর নাম ছিলো ছপুরা, ওটাকে আমার মা বদলে রেখেছিলেন ছবি। অসাধারণ এক মা ছিলেন আমার, তাই না?) আমি পড়ার টেবিলে বসে কাপ্পুর জন্য কেনা দুটো খাতার একটা নিয়ে খুলে তার পাতায় পাতায় কাপ্পুর ছবি আঁকলাম। বুঝতেই পারছেন, ছবি আমি মোটেই আঁকতে শিখিনি তখনো। ইস্কুলে মাটির হাঁড়ি,

আম, কলা, পেঁপে এগুলো আঁকতে হতো। সে সবও আমি ভালো আঁকতে পারতাম না। কখনো আমার কলা দেখতে আমের মতো হতো, আর আম কলার মতো। কাজেই কাপ্পুকে বিকট করে আঁকতে আমার কোনো কষ্টই করতে হয়নি। প্রতিটা পৃষ্ঠায় ওর বিকৃত মুখাকৃতি, আর নিচে বড়ো করে লিখে দিলাম – গাপ্পু। নিজের কাজে মুগ্ধ হয়ে চললাম কাপ্পুদের বাড়ি। কাপ্পু যখন খাতাটা খুলবে তখন ওর চেহারাটা কেমন হবে সেটা কল্পনা করে তখনই দারুণ চিত্তসুখ অনুভব করলাম। আফসোস এতটুকুই যে সেই দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখতে পাবো না। না-ই পেলাম।

দরজা খুললো কাপ্পুই।

- এনেছিস? দে খাতা পেন্সিল। বলে হাত বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে, কিন্তু ওর চোখ যেন আমার চেহারায় কিছু একটা খুঁজছে। আমি খাতা-পেন্সিল ওর হাতে তুলে দিয়েই ছুটে বেরিয়ে যেতে গেলে কাপ্পু শক্তভাবে আমার হাত ধরে টেনে ঘরের ভিতরে নিয়ে এলো, তারপর দরজার ছিটকানি লাগিয়ে দিলো। ওকে দরজা লাগাতে দেখে আমার বুক ধরাস করে উঠলো। ব্যাপার কী, কিছু সন্দেহ করেছে নাকি?

- এই, তোকে চোরের মতো লাগছে কেন রে, কী করেছিস? ফিরতি আনিটা খরচ করে ফেলেছিস? দে, ফেরত দে পয়সা।

আমি আমার ইংলিশ প্যান্টের (শর্টস্) পকেট থেকে আনিটা বের করে ওর হাতে দিলাম।

- এবার আমি যাই, বলে কাপ্পুর হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলাম।

- দাঁড়া, গুড্ডু, যাবি না। চেঁচিয়ে উঠলো কাপ্পু। – কী করেছিস তুই? তোর চেহারা বলছে কিছু একটা করেছিস।

চকিতে আমার দৃষ্টি চলে গেলো কাপ্পুর হাতে ধরা খাতা দুটোর দিকে। কাপ্পু আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তার হাতে ধরা খাতার দিকে তাকালো। কী মনে করে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে একটা খাতা খুললো ও। ওটাতে কিছু নেই। পরক্ষণেই ওর কিছু একটা সন্দেহ হলো। দ্বিতীয় খাতাটিকে অন্যটার

চাইতে ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে। আমি দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই ও এক ছুটে এসে দরজায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে খাতার পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলো। আমি তখন আতঙ্কিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছি। কাপ্পুকে দেখে মনে হলো ও বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে। এরপর কাপ্পু আমাকে কানে ধরে টেনে নিয়ে গেলো ওর পড়ার ঘরে। তারপর দরজা বন্ধ করে দুটো ছিটকানিই লাগিয়ে দিলো।

- বোস্ এখানে, বলে ওর চেয়ারটা এগিয়ে দিলো আমার দিকে।

- এবারের মতো আমাকে ছেড়ে দাও কাপ্পু, আর কখনো এরকম করবো না।

- চোওপ! এমন জোরে চিৎকার করে উঠলো কাপ্পু যে আমার মনে হলো ওই হুঙ্কার রাস্তার লোকেরাও সব শুনতে পেয়েছে। একটা একটা করে খাতার পাতা ছিঁড়তে লাগলো কাপ্পু। পরে সেগুলো দুমড়ে মুচড়ে মুঠো করে গোল বলের মতো বানাতে থাকলো।

- শোন্, গুড্ডুর বাচ্চা, এই কাগজের গোল্লা একটা একটা করে খাবি তুই এখন। আমাদের বাসায় তোর নাস্তা এগুলো। না খেলে খালাম্মাকে যেয়ে দেখাবো এই খাতা।

আমার চোখে ততক্ষণে পানি এসে গেছে। এতবড়ো সঙ্কটে আর কখনো পড়িনি। আমি বেশ বুঝতে পারলাম দুটো পছন্দের মধ্যে কাগজ খাওয়াটা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। কী কারণে জানি না, মা কাপ্পুকে খুব পছন্দ করতেন, আর তিনি বড়ো ছেলেকে শাসনের ক্ষেত্রে দারুণ উদার। তার লম্বা ডাঁটের তালপাখা আমার পিঠে যতোবার পড়েছে ততোবার সেটা হাতপাখা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। সেদিন তিনটে কাগজের গোল্লা আমাকে খেতে, মানে পেটে চালান করতে হয়েছিলো। এরপর বমি না করে ফেললে আরো ক'টা যে খেতে হতো তা কাপ্পু আর আল্লাহ জানেন। এই হলো কাপ্পু। তবে আমার জন্য এই চরম অপমানজনক বিষয়টি কাপ্পু আর আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কাপ্পুর বিশেষ দয়া, সে আর কাউকে জানিয়ে দেয়নি ঘটনাটি।

এরকম আরো কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা আপনাদের বলতে পারি, যাতে দশ এগারো বছরের বালিকা কাপ্পু আট-ন'বছরের একটি বালকের প্রতি কতোটা অত্যাচার করেছে, কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই (আমি অন্তত তাই বিশ্বাস করতাম)। কাহিনিটাকে বেশি লম্বা করবো না। আপনারা বিরক্তি ভরে লেখা ছেড়ে উঠে যাবার আগে আর কেবল একটি ঘটনা। ওটাই গভীর ভাবে দাগ কেটে আছে আমার অন্তরে আজ পর্যন্ত। সেই কাহিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমি ভুলবো না, ভুলতে পারবো না।

মনে আছে? আমাদের বাড়ির পেছনে একটা খাল আছে, বলেছিলাম? শীতকালে খালটাতে তেমন পানি থাকে না। তবু যথেষ্ট থাকে যাতে খালপাড়ের প্রতিটি বাড়ির মানুষজন সেই পানিতে থালাবাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, ইত্যাদি কাজ করতে

পারে। বর্ষার সময়টায় ওই খাল অনেকখানি চওড়া হয়ে যায়, খল খল করে পানি বয়ে যায় তখন প্রচণ্ড স্রোতে। কোনো জায়গায় প্রবল ঘূর্ণি তৈরি করে বয়ে যাওয়া স্রোত দেখে শীতকালে ওর শান্ত সৌম্য চেহারা আন্দাজই করা যায় না। খালটির বক্ষদেশ কোথাও গভীর, কোথাও তেমন গভীর নয়। শীতকালে এর যে কোনো অংশ দিয়ে হেঁটে এপাড় ওপাড় করা যেতো।

জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়ের কোনো একদিন দুপুরে আমি একা নাইতে নেমেছিলাম ওই খালে আরো অনেকদিনকার মতোই। বাঁধানো কোনো ঘাট ছিলো না আমাদের, ছিলো এবড়োখেবড়ো ভাবে ফেলে রাখা কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত দালানের ইট-সিমেন্টের জমানো খণ্ড বা চাঁই। ওগুলোর উপরে বসেই কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ধোয়া, গোসলের জন্য পানিতে নামা সব হতো। তখনো আমি সাঁতার জানি না, কাজেই আমি নামতাম সতর্কভাবে খালের অগভীর অংশে, যেখানে ভরা জোয়ারের সময়ও আমার ডুবে যাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সেদিন কী হয়েছিলো বুঝতে পারিনি। হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে একাই সাঁতার শেখার কসরত করছিলাম, না পায়ের তলায় কোনো শেওলা ধরা পিচ্ছিল পাথরে পা হড়কে গিয়েছিলো, কিছুই বলতে পারবো না। শুধু এটুকু ভালো মনে আছে – জোয়ারের স্রোত আমাকে হঠাৎ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। আমি একবার ডুবে যাচ্ছিলাম, আবার মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠছিলাম, খাবি খাচ্ছিলাম, পানি খাচ্ছিলাম, আর পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, আজ আমি মরতে যাচ্ছি। কোথাও কেউ দেখছে না রেদওয়ান নামের ছোট্টো ছেলেটা খালের পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে এখন।

সেদিন যে আমি মারা যাইনি, তা বলে বোঝাবার কিছু নেই। মরে গেলে এ কাহিনি আজ লিখি কী করে? সেদিন আমি মরিনি, তবে ওই খালের জলে ডুবে মারা গিয়েছিলো কাপ্পু, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে। কোথা থেকে কীভাবে ও টের পেয়েছিলো সে রহস্যের সমাধান কোনো দিনই হবে না। কেবল কাপ্পুই বলতে পারতো কেউ কি ওকে ডেকে বলেছিলো কি না একটি ছেলে পানিতে ডুবে মরছে। খালের ও-পাড়ের কারো চিৎকারে হতে পারে, হতে পারে আকস্মিক ভাবে কাপ্পুই হয়তো খালপাড়ের কাছাকাছি এসেছিলো ওই সময়টায়, শুনতে বা দেখতে পেয়েছিলো হাত-পা ছুড়ে আমার উথালপাথাল, পানিতে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো কাপ্পু নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্য। আমাকে বাঁচালো বটে, তবে নিজে মরে গেলো কাপ্পুটা। আমাকে পাড়ের দিকে ঠেলে দিলেও ততক্ষণে ক্লান্ত কাপ্পু প্রবল স্রোতে নিজেই ভেসে গিয়েছিলো সেদিন। ওকে বাঁচাবার জন্য কেউ ছিলো না সেদিন। শেষ পর্যন্ত কাপ্পু!

আমিতো ওকে ক্ষমা করেই দিয়েছি; ও কি আমাকে ক্ষমা করেছে? কোনও দিনই তা জানা হবে না আমার।

*****

গোধূলি বিকেল বেলা

মো. রাশেদুল ইসলাম রাশেদ
সিনিয়র অফিসার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

শহরের যান্ত্রিক কোলাহলে দাঁড়িয়ে আছি বাস আসার অপেক্ষায়। প্রতিদিন একটাই রুটিন, ঠিক সকাল ৬.৩০ মিনিটে অফিসে যাওয়ার ব্যস্ততা।

আচ্ছা আগে আমার পরিচয়টা দিই। আমি রাশেদ, একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করি। আমাকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটা রুটিনমাফিক চলতে হয়। ভোর ৫ টায় ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে, সকালের নাস্তা খেয়ে, রেডি হয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকি বাসের অপেক্ষায়। অফিসে আসার পর অফিসের কাজ শেষে ঠিক রাত ৮ টায় অফিস থেকে বেরিয়ে একটা শান্তির নিশ্বাস নিই। উফ! এতক্ষণ মনেহয় জেলখানায় বন্দি ছিলাম। এভাবেই কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন, বয়সটা প্রায় ২৮ পেরিয়ে ২৯শে দাঁড়িয়েছে। আর কত নির্দিষ্ট নিয়মে চলা যায়! মন চায় মাঝেমাঝে উড়াল দেই কোনো অজানা উদ্দেশে, যেখানে প্রকৃতি তার আদলে আমাকে টানবে। চারিদিকে থাকবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মৃদু বাতাস আর গোধূলি লগ্নে পড়ন্ত বিকেল। এসব কথা ভাবতেই মনটা কেমন জানি আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু বাস্তবতাটা একটু ভিন্ন।

সংসার জীবনে নানান চাহিদা, একেকজনের একেক আবদার। সবার সব আহ্লাদ পূরণ করতে হিমশিম খেতে হয়। মাস শেষে যে বেতন পাই তা দিয়ে বাসা ভাড়া, মাসিক বাজার, গ্রামের বাড়িতে মা-বাবাকে টাকা পাঠানো, সহধর্মিনীর বিশ্ববিদ্যালয় খরচ সব মিলিয়ে অনেকটা চাপের মধ্যে থাকতে হয়। এদিকে আমাদের অফিসে বছর না ঘুরলে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট হয় না। যাহোক ভালোমন্দ নিয়েই জীবনযাত্রা একরকম চলছে। অফিস, সংসার নিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত জীবন পার করতে হয়। মাঝে মাঝে অনেকটা ক্লান্ত লাগে।

একদিন অফিসে কাজের ফাঁকে স্যারকে বললাম- 'স্যার আমার ৪ থেকে ৫ দিনের ছুটি লাগবে।' স্যার বললেন- 'আচ্ছা, বলেন কেন আপনার ছুটি লাগবে?' স্যারকে বললাম- 'ফ্যামিলি নিয়ে কোথাও ঘুরে আসতাম এই জন্য

ছুটি লাগবে।' স্যার বিরক্ত কণ্ঠে বললেন- 'কী বলেন এসব! আপনি কি সরকারি চাকুরি করেন যে চাইলেই আপনাকে ৪-৫ দিনের ছুটি দিবো? দেখুন এখন অনেক কাজের চাপ, এভাবে আপনাকে ছুটি দেওয়া যাবে না। আর আপনি ছুটিতে থাকলে আপনার কাজ কে করবে শুনি? ৪-৫ দিনের ছুটি আমি আপনাকে কোনো মতেই দিতে পারবো না, আমি বড়োজোর ২ দিনের ছুটি দিতে পারি, তার বেশি না।' স্যারের কথা শুনে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। আমার জীবনের খারাপ একটা মুহূর্ত ছিলো সে দিনটি।

অফিস থেকে বাসায় আসলাম। আমার সহধর্মিনী আমাকে বলল, 'কী ব্যাপার স্যার, মুখটা এমন হুতুম প্যাঁচার মতো গোমড়া করে রেখেছেন কেন? মন খারাপ?' আমি বললাম- 'তেমন কিছু না।' সে আবারো জানতে চাইলো- 'অফিসে কোনো সমস্যা?' আমি বললাম- 'তেমন কিছু না বললাম তো, বার বার এক কথা বলো কেন?' সে আমাকে বললো- 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও ফ্রেস হয়ে আসো আমি খাবার দিচ্ছি।' ফ্রেস হয়ে এসে রাতের খাবার খেয়ে ভাবছি কীভাবে দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া যায়। আমার মনে হলো- বুধবার, বৃহস্পতিবার ছুটি নিবো, শুক্রবার একদিন বোনাস, মোট তিন দিনের ছুটি।

এই তিনদিনের ছুটিতে প্রথমে ভাবলাম কক্সবাজার, সিলেট, সাজেক ভ্যালি এর মধ্যে কোনো একটা জায়গায় ঘুরতে যাবো। প্রথমে কক্সবাজার, গুগোল ম্যাপে সার্চ দিয়ে দেখলাম ঢাকা থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ৩৯২ কি.মি., বাসে গেলে ৯-১০ ঘণ্টার জার্নি।

পরক্ষণে মনে পড়ে গেলো পুরোনো কিছু স্মৃতির কথা, শৈশব-কৈশর জীবন যেখানে পার করে এসেছি, সেই চিরচেনা ছোটো শহর কুড়িগ্রাম। চোখের সামনে ভেসে আসে ছোটো বেলার কথা, আমার খুব মনে পড়ে কুড়িগ্রাম ধরলা নদীর পাড়। এই কুড়িগ্রামে আমার জন্ম, ভাবতেই ভালো লাগে। নদীর পাড় ঘিরে সাদা কাশবন, একঝাঁক সাদা বক, মৃদু বাতাস চারিদিকে, ঢেউ খেলে কলকল নদী। এতো অপরূপ সৌন্দর্য... কেন জানি মন টানে কুড়িগ্রাম এর দিকে। তাই অন্য কোথাও যাওয়ার প্ল্যান মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম।

তারপর আবারো গুগোল ম্যাপে সার্চ দিয়ে দেখলাম ঢাকা থেকে কুড়িগ্রামের দূরত্ব ৩৩৪ কি.মি., বাসে গেলে ৭-৮ ঘণ্টা সময় লাগে, যদিও আমি আগে থেকেই তা জানি। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম

তিনদিনের ট্যুরটা হবে আমার প্রাণের শহর কুড়িগ্রামে।

ফাইনালি ঘুরতে যাচ্ছি, সাথে যাচ্ছে আমার সহধর্মিনী। ঢাকার বাসায় খাওয়া দাওয়া শেষ করে রেডি হয়ে ঠিক রাত ১০ টায় বাসে উঠলাম। বাস জার্নি যদিও অনেক বিরক্তের, তারপরেও কেমন জানি খুশি খুশি লাগছে।

ঠিক সকাল ৫ টায় বাস থামলো কুড়িগ্রামে। বাড়িতে এসে টানা একটা ঘুম দিলাম। ঘুম থেকে উঠে ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে কথা বললাম ও খাওয়া দাওয়া করলাম। ঘড়ির কাঁটায় ১২টা বেজে ১০ মিনিট, একটা রিকশা ভাড়া করলাম। রিকশা নিয়ে আজ সারাদিন ঘোরাঘুরি করবো। কুড়িগ্রামের স্মৃতিবিজড়িত কিছু জায়গা আছে, যেখানে ঈদের ছুটিতে ঘোরা হয় না।

প্রথমে গেলাম আমার প্রাথমিক স্কুলে- খলিলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই স্কুলে কতই না স্মৃতি, মনে হচ্ছে এইতো সেদিন এই স্কুল মাঠে খেলেছিলাম বন্ধুদের সাথে। ছোটোবেলায় বাবার কাছ থেকে ২ টাকা নিতাম, ২ টাকা দিয়ে ঝালমুড়ি, চানাচুর বা চকলেট কিনে খেতাম। স্কুল গেইটে 'শাহীন ভাইয়ের আচার' নামে ভ্রাম্যমান দোকান ছিলো, কিন্তু এখন আর নেই। স্কুল অফিস কক্ষে গেলাম, পুরোনো শিক্ষক একজন বাদে কাউকে চোখে পড়লো না। তিনি ছিলেন আমার শিক্ষিকা, ফেরদৌসি ম্যাডাম। ওনার সাথে কিছু কথা বলে বিদায় নিলাম।

প্রাইমারি স্কুল থেকে বেরিয়ে হাই স্কুলে গেলাম। হাই স্কুল এখন আর আগের মতো নেই। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। খোলা মাঠের চারিদিকে দেওয়াল, বড়ো একটা গেইট, নতুন ভবন, শহিদ মিনার, যা আমাদের সময় ছিলো না।

একদিন হয়েছিলো কী, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে টিফিনের সময় বরই পাড়তে গিয়েছিলাম, আর এদিকে আমাদের ক্লাসে দেরি হয়ে যাওয়ায় মিনহাজুল স্যারের (গণিত শিক্ষক, সাধারণত টিফিনের পরের ক্লাস নিতেন) হাতে সেই পিটুনি খেতে হয়েছিলো। সে কথা আজও মনে পড়ে। তবে এখনকার সময়ে শিক্ষকরা আর আগের মতো পিটুনি দেয় না বললেই চলে।

এরপর রিকশা নিয়ে যাচ্ছি 'কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট'। সেখানে রয়েছে পাঁচ বছরের স্মৃতি, যেটা ভোলার না। এই পলিটেকনিক ঘিরে রয়েছে কত হাসি, দুঃখ, বেদনা। আমার সাবজেক্ট ছিলো- আর্কিটেকচার। ছোটোবেলা থেকেই আমি আঁকা-আঁকি করতে পছন্দ করতাম। তাই

আর্কিটেকচার সাবজেক্টটা আমার অনেক পছন্দের ছিলো। আমার বাবার ইচ্ছে ছিলো আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, অনেক টাকা ইনকাম করে, বাড়িতে পাঁচ তলা ফাউন্ডেশন করবো। চার ভাই, বাবা-মা, সবাই মিলে সেই বাড়িতে থাকবো। যদিও এখন পর্যন্ত আমার বাবার সেই আশা পূরণ করতে পারিনি। কিন্তু মনে প্রাণে ইচ্ছে আছে।

পলিটেকনিকে থাকা কালে সব বন্ধুরা মিলে ক্লাসের পরে আড্ডা দিতাম ক্যাম্পাসে। পলিটেকনিকে আমি রোভার স্কাউটস এর একজন সিনিয়র রোভারমেট ছিলাম। তাই সাংস্কৃতিক অনেক প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। সেই রোভার স্কাউটস রুমটি এখন আছে কিন্তু আগের কেউ নেই। সবাই যে যার জীবন-জীবিকার কাজে ব্যস্ত। পলিটেকনিক থেকে বেরিয়ে সামনে একটা টং দোকানে হালকা কিছু নাস্তা খাওয়ার জন্য গেলাম। আমি, আমার সহধর্মিনী ও রিকশাওয়ালা মামা, নাস্তা করছি। এমন সময় টং দোকানের ভেতর এক চাচার সাথে দেখা হলো। চাচা কুড়িগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বললেন- "কী বাহে কোনদিন আসলেন ঢাকাত থাকি? গ্রামের কথা ভুলিই গেইছেন। ওই ঈদ ছাড়া তোমরা বাড়িত আইসেন ও না। ঈদ ছাড়াও মাঝে মধ্যে আসবেন বাহে। তোমরা গুলা গ্রামত আসলে ভালোই লাগে। যাইহোক বউমাসহ আমার বাড়ি বেরায় যান।"

আচ্ছা কুড়িগ্রাম নিয়ে কিছু কথা বলি- শান্তির শহর "কুড়িগ্রাম"। এখানে রয়েছে সহজ-সরল মানুষ, যারা অতি সহজেই মানুষকে আপন করে নেয়। এখানে রয়েছে ফসলি মাঠ, পাখির ডাক, ছোটো নদী, ডিঙ্গি নৌকা, সাদা কাশফুলের বন আর সবুজের সমারোহে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

টং দোকান থেকে বেরিয়ে রিকশায় উঠলাম। এখন যাবো চিরচেনা ধরলা নদীর পাড়ে। ধরলা নদীর ব্রিজে এসে রিকশা চালক মামার ভাড়া মিটিয়ে আমরা দুজন নদীর পাড়ে বসলাম। নদীর পাড় ঘিরে বইছে মৃদু বাতাস, পানির কলকল শব্দ, সাদা কাশফুল দোল খাচ্ছে বাতাসে।

ছোটো একটা নৌকা ভাড়া করে নদীর ওপারে আসলাম কাশ তুলতে। মুঠো ফোন দিয়ে আমি ও সহধর্মিনী মিলে অনেক ছবি উঠালাম।

একদিকে ধরলা ব্রিজ, ধরলা নদী ও অন্যদিকে সাদা কাশবন, আহা! প্রাণভরে প্রকৃতির সুবাস নিচ্ছি। প্রকৃতি দেখতে দেখতে বিকেল ঘনিয়ে এলো।

ঘড়ির কাঁটায় ঠিক বিকেল ৫টা বাজে, সময়টা গোধূলি লগ্নের। সূর্যের তেজ আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছে। পড়ন্ত বিকেলে রক্তিম আলোর আভা আকাশে বিস্তার করছে চারিদিকে। নিজেকে কবি কবি মনে হচ্ছে। তাইতো মুহূর্তেই কবিতা বানিয়ে সহধর্মিনীকে শুনালাম-

"আহা! কত সুন্দর গোধূলি লগ্ন, তাতে শুধু তুমি আর আমি থাকি মগ্ন। গোধূলি লগ্নে তোমার পরশে জুড়াই আমার প্রাণ, তুমি আছো তাই চারিদিকে যেন আনন্দেরই বান।"

আমার কবিতা শুনে সে অনেক মুগ্ধ। আজকের এই দিনটি আমাদের জীবনের খুবই স্পেশাল।

এদিকে বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো, যদিও মন চাচ্ছে না বাড়িতে ফিরতে। মন চায় আরো কিছু সময় কাটাই এই মনোরম পরিবেশে। কিন্তু কিছুই করার নেই। অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিকে। একটা রিকশা নিয়ে বাড়িতে ফিরছি আর মনে মনে ভাবছি আর দুদিন যদি ছুটি বাড়িয়ে নিতে পারতাম তাহলে কতই না মজা হতো। কী আর করার, ছুটিতো তিন দিনের। বাড়িতে এসে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমালাম। পরেরদিন ঢাকা ফেরার পালা।

আমি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ফ্রেস হয়ে মায়ের রুমের দিকে গেলাম। আমার মা কিছু একটা পলিথিনের ভেতর ঢুকিয়ে বাঁধছে। 'এসব কী মা!' উত্তরে মা বলল- "এসব হচ্ছে তোমার পছন্দের সিদল শুটকি, সুকতানি আর কিছু দেশি হাঁস, মুরগি। ঢাকায় যাওয়ার সময় তোমরা নিয়ে যাবা।" উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী খাবার হচ্ছে এসব। রাতের খাবার খেয়ে পরিবারের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ১০টার বাসে উঠলাম।

পরিবারের প্রতি মায়া, ভালোবাসা, অনুভূতি কাজ করে যখন তাদের কাছে বিদায় নিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া হয়। একদিকে গাড়ি চলছে আর অন্যদিকে আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। পরিবার পরিজন ছেড়ে থাকা অনেক কষ্টের।

ভোর ৫.৩০ মিনিটে ঢাকায় এসে নামলাম। বাসায় এসে ফ্রেস হয়ে সকালের নাস্তা খেয়ে অফিসে যাওয়ার ব্যস্ততা, আবার সেই যান্ত্রিক জীবন! তবে মনটা যেন এখনো পরে আছে ফেলে আসা সেই গোধূলি বিকেলে।

*****

বিরহ বিষাদ

মো. সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার, ইন্টারনাল অডিট
ব্যাবিলন গ্রুপ

দিনে ঘুম রাতে জাগে নিশাচর পাখি,
আমি কেন জেগে রই মেলে দুটি আঁখি?
কেউ কভু কোনোদিন রাখেনি তো খোঁজ,
নিশাচর পাখিদের সাথি হই রোজ।

সূর্যটা ঢলে পরে উঁকি মারে চাঁদ,
অন্তরে জেগে ওঠে বিরহ বিষাদ।
ধরণির বুকে আসে জোছনার আভা,
টলমল করে বুকে অগ্নির লাভা।

রাতের গভীরে হয় জোনাকির মেল,
অপরূপা দুনিয়াটা মনে হয় জেল।
পরিবেশ যত হোক মুগ্ধতা ছোঁয়া,
অনুভব করি সব কালো মেঘ ধোঁয়া।

আঁখিদ্বয়ে ভেসে উঠে আল্পনা স্মৃতি,
তাই দেখে কেটে যায় পূর্ণিমা তিথি।
রবি ফের জেগে উঠে নিশি হয় ভোর,
মন জুড়ে রয়ে যায় আঁধারের ঘোর।

*****

আমারে দিবোনা ভুলিতে

আয়েশা সিদ্দিকা আরজু
এক্সিকিউটিভ-ওয়েলফেয়ার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

আমি বেঁচে থাকতে চাই তোমার ছায়ায়, মায়ায়, কল্পনায়।
আমি বেঁচে থাকতে চাই তোমার পাওয়া, না পাওয়ায়, অপূর্ণতায়।
থাকতে চাই তোমার চিন্তায়, তোমার নিকোটিনের ধোঁয়ায়।
তোমার নির্ঘুম রাতে, তোমার ঘুমন্ত প্রভাতে।
আমি বেঁচে থাকতে চাই হাত ঘড়িতে, তোমার বুকপকেটে।
আমায় রেখো, তোমার প্রার্থনাতে।
ব্যালকনির অপরাজিতা আর হাজার গোলাপের মাঝে,
সন্ধ্যামালতির লতা-পাতায়।
আমি বেঁচে থাকতে চাই, তোমার পারফিউমের ঘ্রাণে,
তোমার দেখা স্বপ্নের অপ্সরাদের ভিড়ে।
আমি বেঁচে থাকতে চাই, তোমার ওয়ালেটে লুকিয়ে রাখা টাকার ভাঁজে,
তোমার সকল ব্যস্ততায়, তোমার অবসরে।

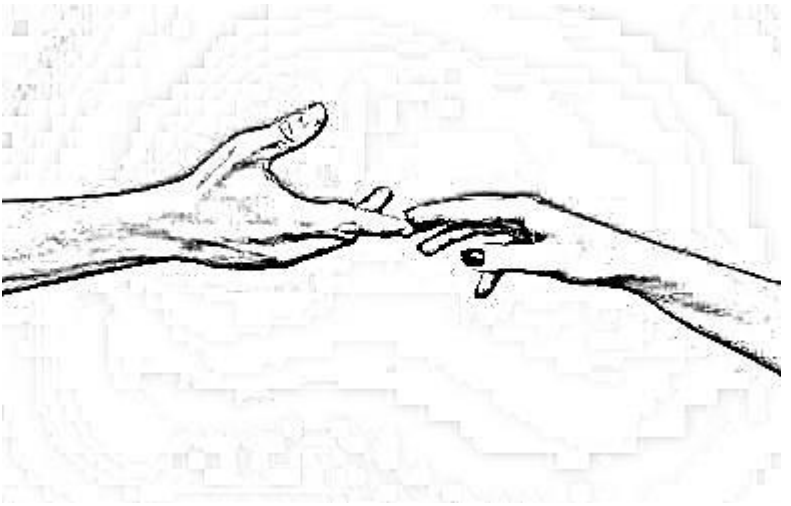

তোমার শীতের কাঁথা হবো, প্রিয় উপন্যাসের পাতা হবো,
শ্রীকান্তের গানে রবো, তোমার ইয়ারবাড হবো,
ধোঁয়া উঠা কফিতে, ল্যাপটপের প্যাডে,

চশমার গ্লাসে, তোমার ব্যাকব্রাশ করা সিল্কি চুলে,
আমি বেঁচে থাকবো।
তোমার বাড়ির মেঠোপথে ছড়িয়ে থাকা হিজলের ফুলে ফুলে,
শিউলি ফোটা সকাল বেলা, শিশির ভেজা ঘাসে।
আমি বেঁচে থাকতে চাই মায়ের আঁচলে,
বেঁচে থাকতে চাই বাবার করুণ চোখের চাহনিতে।
আলমারিতে সাজিয়ে রাখা তোমার প্রিয় পোশাকে,
বিছানার নরম তোশকে, বালিশে, তোমার সকল নালিশে।

তোমার ভালোবাসায় বেঁচে রবো, থাকবো তোমার শাসনে,
তোমার লোমশ বুকের ঘামে, ঝরনার শীতল জলে।
খুলে যাওয়া পাঞ্জাবির বোতাম, আয়না, চিরুনি,
মুখ মোছা তোয়ালে, তোমার ঘরের চার দেয়ালে।
আমি বেঁচে থাকতে চাই ফুরিয়ে যাওয়া তেলের শিশিতে,
তোমার প্রিয় পাতলা ডাল, ইলিশ মাছ আর লাউ পাতার ঝোলে,
বেঁচে থাকতে চাই তোমার প্রিয় সাদা রং-এ,
রিয়েল মাদ্রিদের ফুটবল ঝড়ে।
অভিমানী রাতে, হারিয়ে যাওয়া সময়গুলোতে,
আমি বেঁচে থাকতে চাই।
আমার অসুস্থতায় জেগে থাকা তোমার নির্ঘুম রাত,
ব্যথার কষ্টে বুলিয়ে দেয়া তোমার দুটি হাত,
আদর যত্নে সারিয়ে তোলা তোমার পরম সেবায়,
বেঁচে থাকতে চাই।
রাগের বশে তোমায় বলা আমার কথার ধার,
সবকিছু সহ্য করে মেনে নেয়া হার,
তোমার প্রতিটি রক্ত কণিকায়, তোমার গায়ের ঘ্রাণে।
আমি বেঁচে থাকতে চাই, যখন আমি থাকবো না,
ভুলে যেতে চাইবে যত, পড়বো মনে তত।
ভোরের রোদ হয়ে, পড়ন্ত বিকেল হয়ে, ঘুমন্ত রাত হয়ে,
আকাশের চাঁদ হয়ে, পাখির গান হয়ে, নদীর ঢেউ হয়ে,
আমি রবো নীরবে, আমারে দিবো না ভুলিতে।

*****

অভিযোগ

মো. রফিকুল ইসলাম
ডেপুটি ম্যানেজার, ক্যাড অ্যান্ড প্যাটার্ন
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

তুমি আমার হাসি দেখেছো
দেখোনি চোখের জল,
তুমি আমার সুখ দেখেছো
দেখোনি বেদনার তল।

কান্না লুকিয়ে হাসতে শিখেছি
মরে শিখেছি বাঁচতে,
আঁধার লুকিয়ে জীবনের রঙে
নিজেকে শিখিয়েছি সাজতে।

সবার সুখে দুঃখ কিনেছি
গোপনে লালন করতে,
দেহ বাঁচিয়ে মন কীভাবে
জেনেছি হয় মারতে।

আমি সুখে আছি, তুমি সুখী হও
তবু কেন বোঝো না হায়!
একটাই জীবন, একটাই মরণ,
তাই জীবনটা রাঙানো চাই।

সব পথিক পথ খুঁজে পেলে
পথের হয়ে যায় শেষ,
পথভোলা পথিকের গল্পের
কি থাকে আর কোনো রেশ?

আমি সুখে আছি, তুমি সুখী হও
সব দেনা পাওনা ভুলে,
শুধু আমার প্রতি তোমার অভিযোগ
নিও না কখনো তুলে।

*****

ক্যাথিড্রাল

এস এম আরিফ রাজ্জাক
সিওও
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

স্ত্রীর বন্ধু আমাদের সাথে এক রাত কাটানোর জন্য আসবেন। ভদ্রলোক অন্ধ। তার স্ত্রী গত হয়েছে বহুদিন আগে। আমাদের এখানে আসার পথে তিনি তার মৃতা স্ত্রীর এক আত্মীয়ের সাথে দেখা করার জন্য কানেটিকাটে যাত্রা বিরতি করবেন। ভদ্রলোক তার সেই আত্মীয়ের বাসা থেকে আমার স্ত্রীর সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। আমার স্ত্রীর সাথে আলোচনা করে ঠিক করেন যে ট্রেনে আসবেন। পাঁচ ঘণ্টার যাত্রা। ঠিক হয় আমার স্ত্রী স্টেশনে যাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। ওর সাথে আমার স্ত্রীর শেষ দেখা সিয়াটলে, প্রায় দশ বছর আগে। দূরে থাকলেও আমার স্ত্রীর সাথে তার যোগাযোগ থেমে থাকেনি। এক অভিনব মাধ্যমে তারা যোগাযোগ রক্ষা করত একে অপরের সাথে। সেই কথায় পরে আসছি। আমাদের বাসায় ওর আগমন উপলক্ষ্যে আমি কিন্তু মোটেও খুশি হতে পারিনি। লোকটির সাথে আমার কোনো পূর্বপরিচয় ছিলো না। অন্ধত্বের প্রতি আমার বেশ অস্বস্তি বোধ ছিলো। মুভি দেখে অন্ধদের মনস্তত্ত্বের সাথে পরিচিত হই। মুভিতে অন্ধরা ধীর গতিতে হাঁটা চলা করে, তাদের ঠোঁটে কখনোই হাসির চিহ্ন দেখা যায় না, কখনো কখনো মুভিতে অন্ধরা কুকুর নিয়ে হাঁটাচলা করে। মনে-মনে চাইছিলাম না যে কোনো অন্ধ ব্যক্তি আমাদের অতিথি হোক।

এক সামারে সিয়াটলে আমার স্ত্রী হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছিলো। সেই সময়টাতে সে প্রায় অর্থকড়ি শূন্য অবস্থায় ছিলো। সেই সামারের শেষে ও যাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলে কর্মরত ছিলো। ভদ্রলোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিলো না সেই সময়ে। আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও দুজনের মাঝে ছিলো গভীর প্রেমের সম্পর্ক। ঠিক তখনই সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে যায় আমার স্ত্রীর। বিজ্ঞাপনটি ছিল এমন- 'সাহায্য প্রয়োজন! একজন অন্ধ লোককে পড়ে শোনানোর কাজ।' কাজটি জুটে যায়। পুরো সামার জুড়ে অন্ধ লোকটিকে পড়ে শোনানোর কাজ করে আমার স্ত্রী। বিভিন্ন কেস স্টাডিজ, রিপোর্ট পড়ে শোনাতে হতো। কাজ করতে যেয়ে অন্ধ লোকটির সাথে আমার স্ত্রীর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সামার শেষ হলে কাজের চুক্তিও শেষ হয়। বিদায়ের দিনে লোকটি আমার স্ত্রীর মুখ স্পর্শ করার ইচ্ছে প্রকাশ

করেন। সম্মতি জানালে হাত বাড়িয়ে গাল, ঠোঁট, নাক, এমনকি গলার স্পর্শ নেন তিনি। আমার স্ত্রী তার এই স্পর্শের স্মৃতি ভুলতে পারে না। এ নিয়ে তার মনে উঁকি দেয় কবিতা। প্রতি বছরে একটি দুটি কবিতা লিখতো সে। ওর সাথে আমার প্রথম দিকে আউটিং এর সময় সেই কবিতাগুলো পড়ে শোনাতো। ওর মুখে, নাকে, ঠোঁটে অন্ধ লোকটির অঙ্গুলি সঞ্চালনের স্মৃতি, সেই সময়ের অনুভূতি ওর কবিতার বিষয়বস্তু। কবিতা বুঝতাম না আর তাই ওর কবিতা নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ ছিলো না তেমন। তবে এই অনাগ্রহের কথা কখনোই বুঝতে দিতাম না ওকে।

সেই সামারের পরে আমার স্ত্রী অন্ধ লোকটির কাছ থেকে বিদায় নেয় এবং তার এক বাল্যবন্ধুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার সেই প্রাক্তন স্বামী এখন একজন কমিশনড অফিসার। বিয়ের পরে দুজন সিয়াটলে চলে যায়। বিয়ের পরেও অন্ধলোকটির সাথে সম্পর্ক বজায় থাকে। সিয়াটলে আসার প্রায় বছর খানেক পরে সে তার অন্ধ বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করে। এক রাতে আলাবামার এয়ারফোর্স বেইস থেকে তাকে ফোন করে আমার স্ত্রী। অনেকক্ষণ কথা হয় দুজনের। সেই দিন লোকটি আমার স্ত্রীকে অনুরোধ করে তার জীবনের ঘটনা টেপ রেকর্ড করে তার কাছে পাঠাতে। টেপটিতে আমার স্ত্রী এই কথা রেকর্ড করে পাঠায় যে সে তার স্বামীকে ভালোবাসে তবে তারা যে শহরে বাস করে সেই শহর এবং স্বামীর সেনাবাহিনীর পেশা তার দারুণ অপছন্দ!

আমার স্ত্রী তার অন্ধ প্রাক্তন বসকে জানায় সে একজন এয়ারফোর্স অফিসারের স্ত্রী হবার দুঃখের কাহিনি নিয়ে কবিতা লিখছে তবে কবিতাটি এখনো শেষ করতে পারেনি। লেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার স্ত্রীর উত্তরে তার অন্ধ বন্ধুটিও একটি অডিও টেপ পাঠায়। এমন টেপ চালাচালি হয় বেশ কটি বছর। ওদিকে আমার স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীর বদলি হয় বিভিন্ন এয়ার বেইজে যেমন- মুডি এএফবি-তে, ম্যাকগুয়ের এবং সবশেষে ট্রাভিসে। ট্রাভিসে অবস্থানের সময় এক রাতে সে ভয়াবহ একাকিত্বের শিকার হয়। মনে হয় তার কোনো বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন নেই। এমন বিত্রস্ত মানসিক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আধা বোতল জিনের সাথে কয়েক স্ট্রিপ ঘুমের ঔষধ গলাধঃকরণ করে ফেলে। ঘুমের ঔষধ খেয়ে হট শাওয়ার নেয় ও তার পরে বিছানায় শুয়ে ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করার জন্য। বিধি বাম! মৃত্যু ওকে ছোঁয় না।

তার স্বামী ঘরে ফিরে স্ত্রীর এমন অবস্থা দেখে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং স্টোমাক ওয়াশ করে মদ মিশ্রিত ঘুমের ঔষধ বের করে

তাকে বাঁচায়। এই আত্মহত্যা এটেম্পট করার আগে তার মনের কথা টেপ করে অন্ধ বন্ধুটিকে পাঠিয়েছিলো সে। আত্মহত্যার অডিও নোট! এমনভাবে ওর মনের কথা ডায়েরিতে না লিখে টেপ করে রাখার অভ্যেস গড়ে ওঠে! কবিতা লেখার চেষ্টা এবং মনের কথা টেপ রেকর্ড করাটা যেন ওর একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। একটি টেপে অন্ধ বন্ধুকে সে জানায় অফিসার স্বামীকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে চায় সে। অবশেষে একটি টেপে সে তার স্বামীর সাথে ডিভোর্সের কথা জানায় অন্ধ বন্ধুকে। স্বামীর সাথে সম্পর্ক শেষ হলে আমার সাথে ওর দেখা হয়। আমরা প্রায়ই ডেটিং এ যেতাম। আমার কথাও সে নিয়মিত জানাতো তার অন্ধ বন্ধুকে, না চিঠি লিখে নয় অথবা টেলিফোনেও নয়, টেপ রেকর্ড করে।

একদিন ও আমার কাছে জানতে চায় তার বন্ধুর পাঠানো টেপ রেকর্ডিং আমি শুনতে চাই কি না! ওকে খুশি করার জন্য বলি শুনতে চাই। একগ্লাস ড্রিংক নিয়ে সিটিং রুমে বসে ঘটা করে প্রস্তুতি নেই টেপ শোনার জন্য। অন্ধ বন্ধুর পাঠানো একটি টেপ ড্রয়ার থেকে বের করে প্লেয়ার ঢুকিয়ে নব ঘুরিয়ে সাউন্ড এডজাস্ট করে প্লে সুইচ চাপ দেই। দু'এক সেকেন্ডের নীরবতার পরে শুনতে পাই লোকটির উঁচু লয়ে রেকর্ড করা কথা। আমার স্ত্রী নব ঘুরিয়ে ভলিউম কমিয়ে দেয় যেন শুনতে অসুবিধে না হয়। কিছুক্ষণ পরে শুনতে পাই লোকটি আমার নাম উচ্চারণ করছে। এক অচেনা লোক আমার সম্পর্কে কথা বলছে শুনে একটু বিস্মিত হই। শুনলাম লোকটি বলছে- 'তোমার সব কথা শুনে উপসংহারে এটা বলতে পারি!' আর ঠিক সেই সময়ে দরজায় টোকার শব্দ শুনতে পাই। কে এসেছে দেখতে দরজার দিকে এগিয়ে যাই, টেপটিতে রেকর্ড করা কথা আমার আর শোনা হয় না!

আজ কি না সেই লোকটি আমাদের বাড়িতে আসছে অতিথি হয়ে! ওকে নিয়ে শহরে কোথায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া যায় এমনটা ভেবে স্ত্রীকে বলি-
'ওকে বোউলিং-এ নিয়ে গেলে কেমন হয়?'
কিচেনে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল ও। আমার কথা শুনে খোসা ছাড়ানো বন্ধ করে তাকায়! ওর দৃষ্টিতে এক ধরনের শূন্যতা। ওর চোখ থেকে আমার চোখ সরিয়ে নেই।
'যদি আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসো!' স্ত্রী বলে -'এটা আমার জন্য করতে পারো! যদি না ভালোবাসো কোনো ব্যাপার নয়! যদি তোমার কোনো বন্ধু আমাদের এখানে আসতো, অবশ্যই তাকে আমি মন থেকে গ্রহণ করতাম, তার ভালোমন্দের খেয়াল রাখতাম এবং তাকে ভালো রাখতাম!'
কিচেন টাওয়েলে হাত মুছতে মুছতে বলে সে!
'আমার কিন্তু কোনো অন্ধ বন্ধু নেই!' - মুখ ফসকে বের হয়ে যায় কথাটি।

'তোমারতো কোনো বন্ধুই নেই, তুমি নির্বান্ধব!' চাপা কণ্ঠে বলে সে- 'চুপ থাকো! আর হ্যাঁ...!' কিছুক্ষণ নীরব থেকে ও বলে - 'ওর স্ত্রী মাত্র কিছুদিন আগেই মারা গেছেন! লোকটি তার স্ত্রীকে হারিয়েছেন!'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে নীরব থাকি। ও তার অন্ধ বন্ধুটির স্ত্রী সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানায়নি। লোকটির স্ত্রীর নাম বিউওলা! এমন নামতো কালো মেয়েদের রাখা হয়। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করি-

'ওর স্ত্রী কি নিগ্রো?'

আমার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে-

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? –ওর হাতে ধরা আলু মেঝেতে পড়ে স্টোভের নিচে গড়িয়ে যায়।

'কী হয়েছে তোমার? মাতাল হয়ে গেছো নাকি?'

'না না, এমনি জানতে চাইলাম!'

এর পরে ওর স্ত্রীর সম্পর্কে অনেক কথা জানায় আমাকে। আমি আর এক গ্লাস ড্রিংক নিয়ে কিচেনের টেবিলে বসে ওর সব কথা শুনি।

আমার স্ত্রী ওর চাকুরি ছেড়ে চলে আসার পরে বিউওলা অন্ধ লোকটির কাছে চাকুরি নেয়। চাকুরি নেবার কিছুদিন পরে চার্চে ছোটোখাটো আনুষ্ঠানিকতার মাঝে বিউওলাকে বিয়ে করে আমার স্ত্রীর অন্ধ বন্ধুটি। কেউ জানতো না বিউওলার শরীরে আত্মঘাতী ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে। আট বছর এক সাথে থাকার পরে হঠাৎই তার শরীর ভেঙে পড়ে। সিয়াটল হাসপাতালে মেয়েটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মৃত্যুর সময় অন্ধ স্বামী তার হাত ধরে রেখেছিলো। যার সাথে আট আটটি বছর ঘুমিয়েছে, সেক্স করেছে, ঘর সংসার করেছে, তাকে নিজ হাতে কবরে শুইয়ে দিতে হয়েছে চিরদিনের জন্য। মেয়েটির চেহারা কেমন ছিল কোনোদিন দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার। লোকটির এমন দুর্ভাগ্যের কথা শুনে আমার বেশ খারাপ লাগে। লোকটির প্রতি এক ধরনের মায়া অনুভব করলাম। লোকটির স্ত্রীর কথা ভেবে বেশ খারাপ লাগছিলো। একজন নারী যাকে কখনো তার প্রিয়তম চোখে দেখেনি! দিনের পর দিন এক সাথে বাস করেও তার স্বামী কখনো তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেনি। নিজেকে সাজালেও কেউ দেখার মতো ছিলো না তার! চোখে সবুজ আই শ্যাডো, নাকে নাকফুল, হলুদ স্লিকারস এবং বেগুনি জুতো পরলেও কেউ দেখার ছিলো না! কল্পনা করি হাসপাতালের বিছানার পাশে লোকটির হাতের মুঠোয় ওর স্ত্রীর প্রাণবিয়োগ হলেও লোকটি কখনো দেখতে পায়নি ওর স্ত্রীর শেষ মুখচ্ছবি। শুধু অন্ধ চোখ বেয়ে ঝরেছে অশ্রুধারা!

ওর ট্রেন আসার সময় হলে আমার স্ত্রী নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে স্টেশনে যায়। আমি বাসায় থেকে যাই। অপেক্ষা করতে থাকি কখন সে অতিথিকে নিয়ে ফিরবে। গ্লাসে ড্রিংক ঢেলে টিভি অন করে সোফায় বসি। কতক্ষণ বসে টিভি দেখছিলাম জানি

না, গাড়ির শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম ওরা এসে গিয়েছে। গ্লাস হাতে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম আমার স্ত্রী হাসিমুখে গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে হাত ধরে ওকে নামাচ্ছে। লোকটির মুখে দাড়ি। দাড়িওয়ালা অন্ধ মানুষ। অসহ্য! ব্যাকসিট থেকে ওর সুটকেস নামিয়ে ওর হাত ধরে এগোয় দরজার দিকে। গ্লাসের অবশিষ্ট ড্রিংক গলায় ঢেলে টিভি অফ করে দরজার দিকে যাই! চশমা খুলে ফুঁ দিয়ে রুমাল দিয়ে গ্লাস মুছে দরজা খুলে দেখি আমার স্ত্রী ওর হাত ধরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

'এই দ্যাখো, আমার বন্ধু রবার্ট।' অন্ধ লোকটির দিকে মাথা ঘুরিয়ে আমার স্ত্রী বলে, 'রবার্ট, আমার স্বামী! তোমাকে বলেছি না ওর কথা?' - আনন্দে এবং উত্তেজনায় ওর কণ্ঠ একটু কেঁপে ওঠে।

রবার্ট অর্থাৎ আমার স্ত্রীর অন্ধ বন্ধু হাত এগিয়ে দেয়। হাত মেলাই ওর সাথে।

'আমার মনে হচ্ছে কোথায় যেন মিলিত হয়েছি তোমার সাথে!' - ভরাট কণ্ঠে রবার্ট বলে।

রবার্টের এই মন্তব্যের উত্তরে কী বলা উচিত জানা ছিলো না কারণ ওর সাথে তো আমার কোনোদিন কোথাও দেখা হয়নি। কিছু একটা বলতে হয় তাই বলে ফেললাম- 'হয়তো বা!'
এরপরে ওকে স্বাগত জানিয়ে বলি-
'তোমার কথা আমার স্ত্রীর কাছ থেকে অনেক শুনেছি!'
আমার স্ত্রী ওকে নিয়ে লিভিং রুমে প্রবেশ করে।

'বামে রবার্ট!' রবার্ট বামে ঘোরে, আমার স্ত্রী ওর বাহু ধরে সোফার দিকে নিয়ে গিয়ে বলে-
'সোফায় বোসো। দু'সপ্তাহ আগে এই সোফাসেটটি আমরা কিনেছি!'
হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দেয় রবার্টকে।

সোফাটি কেনার পেছনের কাহিনি আমার জিবে প্রায় এসে গেলো কিন্তু কোনোমতে চেপে গেলাম। পুরোনো সোফাসেটটি ছিলো আমার খুব প্রিয় কিন্তু স্ত্রীর জিদে কিনতে হয় এই নতুন সেটটি। রবার্টের সাথে অন্য কথা বলতে শুরু করলাম, যেমন এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, ট্রেনে নিউইয়র্ক জার্নির খুঁটিনাটি, ট্রেনে উঠলে সে ডানে না বামের সিটে বসে এইসব টুকটাক কথা।

'ট্রেন জার্নিটা কেমন ছিলো?' ওকে প্রশ্ন করি -'কোন সাইডের সিটে বসেছিলে?
'এটা আবার কোন ধরনের প্রশ্ন? - তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্ত্রী বলে!
'নাহ, এমনি বললাম আর কি!'
'ডান দিকের সিটে বসেছিলাম!'- রবার্ট বলে- 'গত চল্লিশ বছর আমি ট্রেন জার্নি করিনি। বলতে পারো এই প্রথম ট্রেন জার্নি আমার। সেই ছেলেবেলায় ট্রেনে চড়েছিলাম তাই প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম এর মজা!'
আমার স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে রবার্ট বলে-
'আমাকে কি দেখতে সুদর্শন লাগছে, মাই ডিয়ার?'

ওর প্রশ্ন শুনে মনে হলো হায়রে হতভাগা, অন্ধ হয়ে জন্মানোর জন্য নিজের চেহারা দেখার সৌভাগ্য হয়নি।
'সত্যিই তুমি সুদর্শন রবার্ট!' আমার স্ত্রী হেসে উত্তর দেয়- 'অনেক দিন পরে তোমায় দেখে কী যে ভালো লাগছে জানো না!'
এবার ও আমার দিকে তাকায়। কেন যেন মনে হলো আসলে এটা ওর মনের কথা নয়! হয়তো রবার্টকে খুশি করার জন্য বলছে। ওই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিলো আমি এটা বিশ্বাস করতে চাই। আমি কি ঈর্ষা বোধ করছি রবার্টকে এতো গুরুত্ব দেবার জন্য? শ্রাগ করি!

আমার জীবনে কোনো অন্ধলোকের সাথে আগে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, এটাই প্রথম। আমার চেনাজানা কেউ অন্ধ নয়। সুতরাং তাদের আচার আচরণ এবং তাদের অনুভূতি কেমন আমি জানি না। এই লোকটির বয়স হয়তো চল্লিশ হবে। টাক মাথা, ঝুঁকে পড়া কাঁধ- কুলিদের মতো, ভারী মালামাল বহন করলে কাঁধের অবস্থা যেমন হয় ঠিক তেমন। বাদামি স্যুটের সাথে ম্যাচ করে বাদামি জুতো পরেছে ও। একটি বিষয় দেখে খটকা লাগে আমার! অন্ধরা সাদা ছড়ি এবং কালো রোদচশমা ব্যবহার করে কিন্তু রবার্টের হাতে কোনো ছড়ি নেই, নেই চোখে কালো রোদচশমা। আমি ভাবতাম হয়তোবা কালো চশমা অন্ধদের জন্য একটি আবশ্যক এক্সেসরিজ। ওর চোখের দিকে তাকালাম। অন্য স্বাভাবিক মানুষদের মতোই ওর চোখ। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলে স্বাভাবিক চোখ থেকে ওর চোখের সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরা পড়ে। ভালো করে লক্ষ্য করি, ওর চোখের মণি স্বাভাবিক চোখের মণির চেয়ে একটু সাদাটে।
'ড্রিংক নেবে? কোন লিকার পছন্দ তোমার?' ওকে প্রশ্ন করি!
'আমি তো স্কচম্যান!' হাসতে হাসতে বলে রবার্ট।
'তাই নাকি? বেশ স্কচ আমারও প্রিয় লিকার!' - মুখে হাসি ঝুলিয়ে বলি।
সোফার পাশে রাখা স্যুটকেস আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে, সে যেন স্যুটকেসের অবস্থান নিশ্চিত হতে চাইছে।
এটা দেখে আমার স্ত্রী বলে-
'স্যুটকেসটা কি উপরে তোমার রুমে রেখে আসবো?'
'না, না, ঠিক আছে, রুমে যাবার সময় নিয়ে যাবোক্ষণ!' - রবার্ট বলে।
'একটু জল মিশিয়ে দেবো স্কচে?' - ড্রিংক্স বানাতে বানাতে ওকে প্রশ্ন করি।
'সামান্য জল মেশাও!'
'জানতাম বেশি জল তোমার পছন্দ নয়! স্কচম্যানরা কম জল দিয়ে স্কচ পান করতে অভ্যস্ত!'
আমার মন্তব্য শুনে রবার্ট বলে-
'আইরিশ অভিনেতা ব্যারি ফিটজেরাল্ড কী বলে জানো? বলে আমি যখন জল পানি করি শুধুই জল পান করি আর যখন হুইস্কি পান করি তখন শুধুই হুইস্কি!'
রবার্টের কথা শুনে আমার স্ত্রী হাসিতে ফেটে পড়ে! রবার্ট ওর দাড়ি মুঠো করে উপরে তুলে ছেড়ে দেয়।

তিন গ্লাস হুইস্কি পান করে ফেলি আমরা। এরপরে রবার্টের সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতে থাকি। রবার্ট তার জার্নির গল্প বলতে থাকে। ওয়েস্ট কোস্ট থেকে কানেটিকাটের লম্বা এয়ার ট্রাভেলের অভিজ্ঞতার গল্প, কানেটিকাট থেকে এখানে আসার ট্রেন জার্নির গল্প। এর মাঝে আমরা দুজন আরো দু'গ্লাস স্কচ গলায় চালান করি! কোনো এক পত্রিকায় অন্ধদের নিয়ে আর্টিকেল পড়েছিলাম। আর্টিকেলটিতে বলা হয়েছে অন্ধরা ধুমপান করতে পছন্দ করে না। ধারণা করা হয় তারা মুখ থকে নির্গত সিগারেটের ধোঁয়া দেখতে পায় না আর তাই ধুমপানে তাদের অনীহা। রবার্ট কিন্তু ওই তালিকায় পড়ে না। ও দেদারসে সিগারেট পান করে চলেছে। সিগারেট পুড়তে পুড়তে ফিল্টারে এসে ঠেকলে আর একটি সিগারেট জ্বালাচ্ছে। পাশে সাইড টেবিলে রাখা এ্যাশট্রে স্পর্শ করে ঠিক করে নিয়েছে কোথায় ওটার অবস্থান আর নিখুঁতভাবে সেই এ্যাশট্রেতে সিগারেটের বাট ফেলছে। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী ছাই আর এ্যাশট্রেতে ফেলা ফিল্টারগুলো পরিষ্কার করে এ্যাশট্রেটি সাইড টেবিলে রাখছে। রবার্টকে নিয়ে ডিনার টেবিলে গিয়ে বসি। আমার স্ত্রী রবার্টের প্লেটে স্মোকড পটেটো, কিউব স্টেক আর গ্রিন বিনস পরিবেশন করে। দুটো ব্রেডে মাখন মাখিয়ে রবার্টের দিকে এগিয়ে দেই।

'তোমার ব্রেড রবার্ট! চলো প্রার্থনা সেরে ফেলি!'

রবার্ট মাথা নিচু করে। আমার স্ত্রী হা করে আমার দিকে তাকায় এর কারণ হয়তো এই যে আগে আমি কখনো ডিনার টেবিলে প্রার্থনা করিনি।

মজা করে স্ত্রী বলে-

'প্রার্থনা করো যেন ফোন বেজে না ওঠে এবং খাবার যেন ঠান্ডা না হয়ে যায়!'

আমরা টেবিলে পরিবেশিত সব খাবার সাবাড় করে ফেলি। মনে হচ্ছিল কতো দিনের অভুক্ত ছিলাম। খাবার টেবিলে তেমন কোনো কথাবার্তা হয় না। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম অন্ধলোকটি নিজেই বাটি থেকে খাবার তুলে প্লেটে নিচ্ছে। অন্ধদের ঘ্রাণ শক্তি প্রবল। হয়তো গন্ধ শুঁকে খাবার নির্বাচন করতে পারছে ও। প্লেটের খাবার নিখুঁতভাবে নাইফ দিয়ে কেটে কাঁটাচামচে গেঁথে মুখে নিচ্ছে লোকটি স্বাভাবিক মানুষদের মতো! ডিনার টেবিল থেকে ওঠার সময় লক্ষ করি আমরা রীতিমতো ঘামছি। রবার্ট এবং আমি আবার লিভিং রুমে গিয়ে বসি। আমার স্ত্রী ডিনার টেবিল গোছগাছ করে আমাদের সাথে যোগ দেয়। রবার্ট এবং আমার স্ত্রী সোফায় পাশাপাশি বসে আর আমি বসি বড়ো একটি চেয়ারে। ওরা গত দশ বছরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতিচারণ করছিলো। আমি ড্রিংক্স বানিয়ে রবার্টের হাতে ধরিয়ে দেই এবং নিজেও নেই। মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনি আর মাঝে মাঝে ছোটোখাটো মন্তব্য করি এটা জানাতে যে আমিও লিভিংরুমে ওদের সাথে

উপস্থিত আছি। কান খাড়া করে অপেক্ষা করছিলাম হয়তো এক সময়ে আমার স্ত্রী বলবে... 'এবং এমনভাবে জীবনে আমার স্বামী (আমার) প্রবরের আগমন ঘটে!' দুঃখের বিষয় আমার স্ত্রী এমন কোনো কথা বলে না।

শুনতে পাই রবার্টের গল্প। এ্যামোয়ের ডিস্ট্রিবিউসনের ব্যাবসা করে সংসারের খরচা চালাতো ওরা। এ ছাড়াও শখের রেডিও ট্রান্সমিশন স্টুডিও ছিলো ওর এবং সেই সূত্রে গুয়াম, ফিলিপিনো, এমনকি তাহিতির অপারেটরদের সাথে হয় বন্ধুত্ব। হেসে আমাকে বলে এইসব দেশে বেড়াতে গেলে আমি যেন রবার্টকে জানাই, ও তার বন্ধুদের বলবে আমাদের দেখভাল করার জন্য। আমার সাথে কথা বলার সময় মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে তাকায় যেমনটা স্বাভাবিক মানুষেরা কথা বলার সময় আই কন্টাক্ট করে। আলাপের এক পর্যায়ে রবার্ট জানতে চায় কী চাকুরি করি, এই চাকুরিতে আমি খুশি কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। ওর কথা জড়িয়ে আসছিলো। টিভি অন করি। কথার মাঝে হঠাৎ টিভি অন করাটা ঠিক শোভন না, স্ত্রী কটমট করে তাকায় আমার দিকে। রবার্টের উপস্থিতিতে ওর রাগ ঝগড়াতে গড়ায় না। সে রবার্টের দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে-

'রবার্ট তোমার বাসায় টিভি আছে?'

'আমার বাসায় দুটো টিভি আছে, একটি পুরোনো সাদাকালো এবং অন্যটি রঙিন! টিভি অন করলে সবসময় আমি রঙিন টিভি অন করি! এটা মজার ব্যাপার নয়?' - আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রবার্ট হেসে বলে।

বুঝতে পারি না কী বলা উচিত তাই নীরবে বসে টিভি নিউজ দেখতে থাকি।

'তোমাদের টিভিটা রঙিন টিভি, তাই না?' রবার্ট প্রশ্ন করে। 'আবার জিজ্ঞেস করো না কেমনভাবে বুঝলাম...! বুঝতে পারি...!'

'কিছুদিন আগে কিনেছি টিভিটা!' - আমি বলি।

আরো এক গ্লাস হুইস্কি গলায় চালান করে শরীর এলিয়ে বসে রবার্ট। কয়েকবার দাড়ি মুঠোয় নিয়ে উপরে তুলে ছেড়ে দেয়। এ্যাশট্রেটি কফি টেবিলে রেখে সিগারেট জ্বালায়। আমার স্ত্রীর চোখে রাজ্যের ঘুম। কয়েকবার হাই তোলে ও!

'রবার্ট উপরে যাচ্ছি কাপড় বদল করার জন্য! নিজের বাড়ির মতো ভাবো। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে ওকে বলো!' আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে।

'নিজের বাড়ির মতোই ভাবছি। চিন্তা করো না, ড্রেস চেঞ্জ করে এসো!' - রবার্ট আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে!

স্ত্রী চলে গেলে আমরা নীরবে টিভিতে ওয়েদার ফোরকাস্ট শুনতে থাকি! প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় কেটে যায় কিন্তু ও আসে না! ঘুমিয়ে গেলো নাকি? ঠিক বুঝতে পারি না স্ত্রীর এই অন্ধ বন্ধুকে একা কেমন ভাবে সঙ্গ দেবো! মনেপ্রাণে চাইছিলাম ও যেন এখুনি

ফিরে আসে। কী আলাপ করা উচিত বুঝতে পারি না তাই জানতে চাই আর একটি ড্রিংক নেবে কি না। মাথা নাড়ায় রবার্ট অর্থাৎ আর একটি ড্রিংকে ওর আপত্তি নেই। ম্যারিয়ুয়ানা পানের ইচ্ছে করছিলো ভীষণভাবে! হুইস্কির গ্লাস হাতে ধরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করি ম্যারিয়ুয়ানার শট নেবে কি না!
'নিশ্চয়! বানাও একটা!'

চেয়ার ছেড়ে ওর পাশে সোফায় গিয়ে বসি। দুটো সিগারেট বানাই তামাকের পরিমাণ একটু বেশি দিয়ে। কেন জানি না মনে হচ্ছিল লিকার এবং ম্যারিয়ুয়ানা দুটোরই স্ট্রং ডোজ নিতে, হয়তো আমি এই অন্ধ লোকটির সঙ্গ থেকে মানসিকভাবে মুক্তি চাচ্ছিলাম, হতে পারে এমন কিছু। ম্যারিয়ুয়ানার সিগারেট জ্বালিয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলি-

'রবার্ট সুখটান দাও!'

দু'আঙুলের মাঝে সিগারেটটি ধরে ঠোঁটে লাগায় ও, এক দীর্ঘটান নিয়ে ধোঁয়া ভেতরে নিয়ে ছাড়ে। আমিও ম্যারিয়ুয়ানার সিগারেটে সুখটান দিতে থাকি। মুহূর্তে সারা ঘর ম্যারিয়ুয়ানার গন্ধে মৌ মৌ করতে শুরু করে। এই সময়ে আমার স্ত্রী নেমে আসে লিভিং রুমে। গোলাপি নাইট গাউনের সাথে ম্যাচ করে গোলাপি স্যান্ডেল পরেছে, সুন্দর লাগছে ওকে।

'কিসের গন্ধ এটা?
নাক সিটকে জানতে চায়।

'ম্যারিয়ুয়ানার গন্ধ!'

ওর সুন্দর মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে ওঠে। ও চায় না আমরা মারিয়ুয়ানা পান করি।

'রবার্ট জানতাম না তো তুমি ম্যারিয়ুয়ানার ভক্ত!'

'মাই ডিয়ার! আজকেই প্রথম ম্যারিয়ুয়ানা নিলাম! কিন্তু কোনো ভালো অনুভূতি পাচ্ছি না!'

রবার্ট আমার স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলো কিন্তু ওর উত্তরের আমি প্রতিউত্তর দিয়ে ফেলি-

'আসলে অত কড়া ম্যারিয়ুয়ানা দিয়ে সিগারেট বানাইনি। প্রথম টানছো, হালকা নেশাই ভালো!'

'আরে ভেবো না আমার কিছুই হবে না।' - রবার্ট হেসে বলে!

আমার স্ত্রী রবার্ট এবং আমার মাঝে বসেছিলো। ওর দিকে একটি ম্যারিয়ুয়ানার সিগারেট এগিয়ে দেই। সিগারেটটি নিয়ে দু'আঙুলের মাঝে টোকা দিয়ে আমাকে ফেরত দিয়ে বলে-

'ম্যারিয়ুয়ানা নেবো না, এটা নিলে শুধু ঘুম আসে। আর আজ তো ডিনারে অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছি, তাই ঘুম আসছে।'

'স্ট্রবেরি পাইটার স্বাদ ছিল অসাধারণ। এমন সুস্বাদু খাবার টেবিলে থাকলে বেশি খাওয়া হয়েই যায়!' - রবার্ট হেসে বলে!

'রবার্ট, এখনো ফ্রিজে বেশকিছু পরিমাণ স্ট্রবেরি পাই আছে, এনে দেবো, খাবে নাকি?' - আমি বলি।

'এখন নয়, খিদে পেলে পরে খাবোক্ষণ!' - রবার্ট বলে।

আমি টিভি দেখায় মনোযোগ দেই। স্ত্রী ঘনঘন হাই তুলতে তুলতে বলে-

'রবার্ট তোমার বিছানা তৈরি করে রেখেছি। ঘুমোতে যাবে না? সারাদিন লম্বা জার্নি করে এসেছো, ক্লান্ত নিশ্চয়!'

রবার্টের উত্তর না পেয়ে আমার স্ত্রী ওর বাহু ধরে ঝাঁকি দিয়ে ওকে ডাকে-

'রবার্ট! শুনছো!'

রবার্ট যেন বাস্তবে ফিরে আসে। বলে-

'মোটেই ক্লান্ত নই! ম্যারিয়ুয়ানা দারুণ জিনিস তো!'

'আর একটা সিগারেট নেবে?' - প্রশ্ন করি ওকে।

মাথা নেড়ে সায় দেয়। সুন্দর করে আর একটি সিগারেট বানিয়ে সেটা জ্বেলে ওর দু'আঙুলের মাঝে গুঁজে দেই। ও সিগারেটটি টানতে শুরু করে, দেখে মনেই হচ্ছে না যে আজই সে প্রথম ম্যারিয়ুয়ানা টানছে। এমনভাবে ধোঁয়া লাংসের ভেতরে নিচ্ছে যেন ছোটোবেলা থেকে সে অভ্যস্ত ম্যারিয়ুয়ানা পান করতে।

ঘনঘন কয়েকটি টান মেরে আমার দিকে তাকায় রবার্ট! বলে-

'ধন্যবাদ! এখন একটু একটু ফিল করছি!'

সিগারেটের শেষাংশ আমার স্ত্রীর দিকে এগিয়ে ধরে রবার্ট।

'আরে নাহ, আমার ওসব চলবে না!' ও রবার্টের হাত থেকে জ্বলন্ত বাটটি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে-

'আর কিছুক্ষণ আছি এখানে, ম্যারিয়ুয়ানা নেবার জন্য জোর করো না প্লিজ! আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তোমরা বেডরুমে না গেলে এই সোফাতে বসেই ঘুম দেই!'

রবার্টের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ও আরো বলে-

'রবার্ট আমাদের বেডরুমের পাশের রুমে তোমার থাকার ব্যবস্থা করেছি। যখন এখান থেকে উঠবে আমাকে ডেকো যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি, রুম দেখিয়ে দেবো!'

কিছুক্ষণ টিভির দিকে চোখ রেখে ও সোফার ব্যাকরেস্টে মাথে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। এক সময় টিভিতে খবর প্রচার শেষ হয়। উঠে যেয়ে টিভির চ্যানেল পরিবর্তন করি। চেয়ারের দিকে আসার সময় দেখতে পাই সিলিংফ্যানের বাতাসে আমার স্ত্রীর পায়ের উপর থেকে নাইটি সরে গিয়েছে। তার অনাবৃত শুভ্র থাই হাতির দাঁতের মত জ্বলজ্বল করছে। মৃদু ধাক্কা খেলাম। হতে পারে রবার্ট অন্ধ, অন্ধলোকের সামনে কি নারীর শরীরের অংশ অনাবৃত থাকতে পারে? রবার্ট কি সত্যিই দেখতে পায় না? দেখতে না পেলেও, ও কি উপলব্ধি করতে পারছে

ওর সামনে আমার স্ত্রী অর্ধ উলঙ্গ হয়ে ঘুমোচ্ছে? আমি ওর নাইটি ঠিক করে দেই।

রবার্টকে বলি-
আচ্ছা তুমি না স্ট্রবেরি পাই খেতে চেয়েছিলে। আনবো কি?
'নাহ এখন নয়!'
'তোমায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বেডরুমে যাবে? ওখানে পাই পরিবেশন করি?'
'না না, এখনই রুমে যেতে চাই না। যদি তোমার সময় থাকে এখানেই আরো কিছু সময় আড্ডা দিতে চাই!'
'রবার্ট আমার অনেক সময়, আর তোমার সাথে আমার তো বেশি কথা হয়নি, তোমার বান্ধবী সারাক্ষণ তোমার সাথে বকবক করেছে আমাকে তো সময়ই দেয়নি তোমার সাথে দু'চার কথা বলার।'

আসলে আমি তো মিথ্যে বলছি। একজন অন্ধলোকের সাথে আড্ডা দেবো গল্পগুজব করবো এটা আমি তো ভাবতেই পারিনি। প্রথম যখন আমার স্ত্রী জানালো যে তার এই অন্ধ বন্ধুটি আমাদের বাড়িতে আসবে, সেই সময় থেকে আমার অস্বস্তি বোধ শুরু হয়। আমি ওর সাথে সহজ হতে পারিনি।

আমার কথা শুনে রবার্ট আবার তার দাড়ি মুঠো করে ধরে উপরে তুলে ছেড়ে দেয়। এটা হয়তো ওর মুদ্রাদোষ। কফি টেবিল থেকে সিগারেট প্যাকেট এবং লাইটার তুলে নেয় ও।

'রবার্ট, তোমার সাথে আড্ডা দিতে ভালো লাগছে আমার।'

কথাটি শেষ করতেই জানি না কী যে হলো, এই প্রথম ওর প্রতি ভালোলাগা অনুভব করলাম। প্রতি রাতে আমি ম্যারিয়ুয়ানা নিয়ে অনেকক্ষণ এই সিটিং রুমে একা বসে থাকি। কখনোই আমার স্ত্রী এবং আমি একসাথে বিছানায় যেতে পারি না। ঘুমোলে অদ্ভুত সব স্বপ্নেরা হানা দেয় চোখে। প্রায়ই ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্ন দেখে।

টিভিতে নতুন এক প্রোগ্রাম শুরু হয় মধ্যযুগের চার্চের উপর ডকুমেন্টারি। অন্য প্রোগ্রাম দেখতে চাচ্ছিলাম। টিউন করে দেখতে পাই চ্যানেলগুলোর সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে, অগত্যা আগের চ্যানেল টিউন করে মধ্যযুগীয় চার্চের উপর ডকুমেন্টারি দেখতে শুরু করি। রবার্টের কাছে ক্ষমা চাই চ্যানেল সার্চ করার জন্য।
রবার্ট বিনয়ের সাথে বলে-
'না না, ঠিক আছে যে কোনো প্রোগ্রাম দেখতে পারো আমার কোনো চয়েস নেই! আমি প্রতিনিয়ত শিখি। শেখার কোনো শেষ নেই। আজ রাতেও আমি কিছু শিখতে চাই। দেখতে না পেলেও কান তো খোলা। ওর ডান কান টিভি সেটের দিকে ঘুরিয়ে মনোযোগ সহকারে ডকুমেন্টারির ধারাবিবরণী শুনতে থাকে। দেখতে পাই ওর চোখের পলক ঘনঘন পড়ছে এবং মাঝে মাঝে

দাড়ি মুঠোয় নিয়ে উঁচু করে ছেড়ে দিচ্ছে।

টিভিতে দেখাচ্ছিলো মাথায় শিঙ-এর টুপি এবং কঙ্কালের ছবি আঁকা লেজ বিশিষ্ট ড্রেস পরা একদল লোক কিছু সন্ন্যাসীদের অত্যাচার করছে। ইংরেজি ধারা ভাষ্যকার জানায় ঘটনাটি মধ্যযুগীয় স্পেনে ঘটে। আমি রবার্টকে স্ক্রিনে দেখানো পাত্র-পাত্রীদের কস্টিউম, মুভমেন্ট ইত্যাদির ডিটেইলস বলি।

'লেজ বিশিষ্ট কঙ্কাল আঁকা ড্রেস?' - বিড়বিড় করে প্রশ্ন করে রবার্ট। ঘুমের মাঝে মানুষ যেমন কথা বলে অনেকটা তেমন। মনে হচ্ছিল ও যেন সিটিংরুমে নেই, দূরে কোথাও আছে সেখান থেকে কথা বলছে।

'ওদের সম্পর্কে আমি জানি!'

রবার্টের সাথে যখন এমন কথাবার্তা চলছিল ঠিক তখনই টিভি পর্দায় ভেসে ওঠে একটি ক্যাথিড্রালের দৃশ্য। প্যারিসের এক ক্যাথিড্রাল। কারুকাজ খচিত সিলিঙে ফোকাস করে ক্যামেরা, এরপরে দেখায় জানালা, দেয়াল। এরপরে পর্দায় ভেসে ওঠে অন্য একটি ক্যাথিড্রালের বাইরের দৃশ্য। ক্যামেরা ফোকাস করে ভেতরে। এই সময় ধারাভাষ্যকার নীরব থাকে আর তাই আমার মনে হয় রবার্টকে কিছু একটা বলা উচিত।

'ওরা এখন ক্যাথিড্রালের বাইরের দৃশ্য দেখাচ্ছে রবার্ট! ক্যাথিড্রালের সামনে মূর্তি, মনে হয় ইতালির কোনো ক্যাথিড্রাল। দেয়ালে অনেক পেইন্টিং দেখতে পাচ্ছি!'

'ওগুলো কি ফিয়াস্কো পেইন্টিং?' - গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্ন করে রবার্ট।

আমার গ্লাস হাতে নিয়ে দেখি খালি সেটা। রবার্টের প্রশ্নের জবাব দেই-

'তুমি জানতে চাচ্ছো ওগুলো ফিয়াস্কো কি না, তাই তো? কিন্তু আমি তো জানি না সেটা!'

এই সময় ক্যামেরা লিসবনের আর একটি ক্যাথিড্রালে ফোকাস করে। ইতালি, ফ্রান্স এবং পর্তুগালের ক্যাথিড্রালের ইন্টেরিয়রের তুলনামূলক দৃশ্য দেখাচ্ছে।

আমার মনে কী যে হলো জানি না রবার্টকে বললাম-

'এক অদ্ভুত অনুভূতি আমার মনে খেলা করছে জানো। আচ্ছা বলতে পারো আসলে ক্যাথিড্রাল কী? আচ্ছা ব্যাপ্টিস্ট চার্চ আর ক্যাথিড্রালের মাঝে কি কোনো পার্থক্য আছে?'

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনে রবার্ট। দু'আঙুলের মাঝে জ্বলন্ত সিগারেট নাড়াতে নাড়াতে বলে-

'শতশত শ্রমিকের বংশপরম্পরায় শত বছরের শ্রমে ক্যাথিড্রাল নির্মিত হয়।

টিভিতে তাই বলা হয়েছে। হতভাগা শ্রমিকেরা তাদের সারা জীবন ব্যায় করেছে নির্মাণ কাজে অথচ যখন সেটার কাজ শেষ হয় তখন ওরা আর বেঁচে নেই। যারা সারাজীবন ধরে ইমারত নির্মাণ করে সেটা এক নজর দেখার সৌভাগ্য হয় না তাদের!'

রবার্টের মুখ দেখে মনে হয় কী যেন কল্পনা করছে। হয়তো নিজেকে পর্তুগালে কল্পনা করছে। টিভিতে অন্য আর একটি ক্যাথিড্রাল দেখানো হচ্ছে। এটা জার্মানির একটি ক্যাথিড্রাল। রবার্ট তার মাথা এদিক ওদিক নাড়িয়ে বলে-

'সত্য কথা বলতে কী! এটুকুই আমি জানি ক্যাথিড্রাল সম্পর্কে। যেটা কিছুক্ষণ আগে তোমায় বললাম। এগুলো তো ওই টিভি ভাষ্যকারের বর্ণনা থেকে শেখা। আচ্ছা তুমি কি টিভিতে দেখে একটি ক্যাথিড্রালের বর্ণনা দিতে পারো? আশা করি পারবে!'

টিভি পর্দার উপর মনোযোগ দিয়ে চোখ রাখি। একটি ক্যাথিড্রালের ছবি দেখানো হচ্ছে। প্রস্তুতি নেই ওটাকে বর্ণনা করতে কিন্তু কেমন ভাবে করা উচিত বুঝতে পারছিলাম না। একটা অন্ধলোকের কথা শুনে এখন নাকি আমাকে ক্যাথিড্রালের বর্ণনা দিতে হবে। আবারও চোখ রাখি টিভির পর্দায়।
রবার্টকে বলি-

'ক্যাথিড্রাল খুব উঁচু ইমারত.....!'
আমার কথা শুনে রবার্ট একমনে বলে-
'ক্যাথিড্রাল এতই সুউচ্চ ইমারত যেটা মেঘ ভেদ করে আকাশ ছোঁয়। ক্যাথিড্রাল দাঁড়িয়ে থাকে শক্ত ভিতের উপর। কখনো কখনো ক্যাথিড্রালের সামনের দেয়ালে শয়তানের ছবি খোদাই করা থাকে কখনো বা ঈশ্বর অথবা নারীদের। কেন এসব চিত্র খোদাই করা থাকে সেটার কারণ আমি বলতে পারবো না।'
'মনে হয় আমি ঠিকমত বর্ণনা দিতে পারছি না, তাই না রবার্ট?'

রবার্ট সোফার ব্যাকরেস্টে হেলান দিয়ে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে বসে। মুঠোয় দাড়ি নিয়ে খেলা করতে করতে রবার্ট আমার কথা শোনে। বর্ণনা শুনে মাঝে মাঝে মাথা নাড়িয়ে জানান দেয় এটা বোঝাতে যে আমার কথা ও শুনছে। আর কী কী বলা যায় মনে করার চেষ্টা করি। বলি -
'ক্যাথিড্রালগুলো আসলেই সুউচ্চ! পাথর দিয়ে এগুলো নির্মিত হয়েছে! অনেক ক্যাথিড্রাল মার্বেল পাথর দিয়েও নির্মিত হয়। মধ্যযুগে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করে মানুষ ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে...!'
এই সব বলে আমি থামি!

'ঠিক বর্ণনা দিয়েছো। আচ্ছা একটি প্রশ্ন ছিলো। মনে কিছু করবে না তো প্রশ্নটি করলে? খুব সরল সোজা প্রশ্ন।

হ্যাঁ এবং না দিয়েও উত্তর দিতে পারো। আচ্ছা তুমি কি ধর্মভীরু?'

উত্তরে আমি মাথা নাড়ি। পরক্ষণেই বুঝতে পারি ও তো অন্ধ, আমার মাথা নাড়াটা তো সে দেখতে পায়নি। সুতরাং আমি কী উত্তর দিয়েছি সেটা তো ও বুঝবে না।

আমি বলি-

'মনে হয় ধর্মে আমার অন্ধ বিশ্বাস নেই। ধর্মের আচার আচরণ মেনে চলা খুবই দুষ্কর। বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি!'

'বুঝতে পারলাম কী বলতে চাইছো!'

'তাহলে ঠিক আছে!' - উত্তরে আমি বলি।

টিভিতে প্রচারিত ডকুমেন্টারির ধারাভাষ্যকার তখনো একঘেয়ে কণ্ঠে ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছে। আমার স্ত্রী ঘুমের মাঝে হাই তোলে। একটি লম্বা শ্বাস ফেলে আবারো ঘুমের মাঝে হারিয়ে যায়।

রবার্টের দিকে তাকিয়ে বলি-

'আমাকে ক্ষমা করো, আসলে আমি বলতে পারবো না ক্যাথিড্রাল দেখতে কেমন!'

লোকটি মাথা নিচু করে কী যেন চিন্তা করে কিছুক্ষণ। আমি ওকে আরো বলি-

'সত্য কথা বলতে কী আসলে ক্যাথিড্রাল আমার কাছে কোনো অর্থ বহন করে না। ক্যাথিড্রাল! কিছুই না! আমার মনে হয় এগুলো গভীর রাতের টিভি শো'র মতো কিছু।'

দেখি আমার কথা শুনে রবার্ট কেশে গলা পরিষ্কার করছে। ব্যাক পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে আমাকে বলে-

'শোন, একটি কাজ করতে পারবে? একখণ্ড পুরু কাগজ জোগাড় করতে পারবে? একটি কলমও আনতে হবে। কাগজ এবং কলম নিয়ে আমরা কিছু একটা করবো। আমরা একসাথে কিছু একটি আঁকবো। যাও নিয়ে এসো!'

উপর তলায় যেয়ে পুরু কাগজ খুঁজতে থাকি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার সময় মনে হচ্ছিলো আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে। হয়তো মদ এবং ম্যারিয়ুয়ানার যুগল প্রভাব। আমাদের বেডরুমের ড্রেসিং টেবিলে একটি বলপয়েন্ট কলম খুঁজে পেলাম। পুরু কাগজ খুঁজে পাই না। কোথায় কাগজ পাই? অবশেষে নিচে নেমে কিচেনে যাই। ওয়েস্ট বাস্কেটে বেশ কয়েকটি কাগজের গ্রোসারি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখি। একটি ব্যাগ ঝেড়ে পরিষ্কার করে লিভিংরুমে নিয়ে এসে কফি টেবিলের উপর রেখে ওর হাতে কলম ধরিয়ে দিয়ে বলি কাগজটি কফি টেবিলের উপর। টেবিলের পাশে মেঝেতে বসি, রবার্টও সোফা থেকে

নেমে মেঝেয় আমার পাশে বসে। কাগজের উপর আঙুল চালিয়ে কী যেন অনুভব করার চেষ্টা করে। কাগজটির চার প্রান্ত, চার কোণের সবখানে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে পরখ করে রবার্ট। এই অভিনব পরীক্ষা শেষ করে রবার্ট বলে-
'ঠিক আছে। চলো শুরু করি!'

আমার ডান হাত ওর দিকে এগিয়ে দিতে বলে। ডান হাত এগিয়ে দিলে বলপেনটি ধরিয়ে দিয়ে আলতো করে আমার হাতের উপর হাত রেখে বলে-
'এখন আঁকা শুরু করো। আমি লক্ষ রাখছি। কলাম চালাও!'

ওর কথা মতো আঁকতে শুরু করলাম। প্রথমে একটি বক্স আঁকলাম অনেকটা আমাদের এই বাড়ির শেইপ। বক্সের উপর একটি ছাদ যোগ করলাম। ছাদের উপর লম্বা মিনার এঁকে দোচালা টোপর বসিয়ে দিলাম মিনারটির চূড়ায়।
'অসাধারণ, দারুণ! দারুণ আঁকছো!' - ওর মুখে প্রশান্তি!
আমার দিকে তাকিয়ে বলে-
'এমন ঘটনা তোমার জীবনে ঘটতে পারে আগে কখনো কি ভেবেছো? জীবন এক আশ্চর্য রঙ্গমঞ্চ! আঁকো, আঁকো...!'

লম্বা জানালা, দরজা, ইন্টেরিয়র যোগ করি ড্রয়িংটিতে। আমি যেন থামতে পারছিলাম না, এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে দিয়ে আঁকিয়ে নিচ্ছিলো। ইতোমধ্যে টিভি সম্প্রচার থেমে গেছে। রবার্ট ড্রয়িং এর রেখাগুলোর উপর আঙুলের ডগা ছুঁয়ে পরখ করে। ভাবখানা এমন- যেহেতু দৃষ্টি শক্তি নেই, স্পর্শ করে ড্রয়িংটি দেখছে সে।
অস্ফুট কণ্ঠে বলে-
'দারুণ কাজ!'

আবারো কলম ধরি। রবার্ট আবারো ওর হাতের তালু দিয়ে আমার হাত আলতো করে ছুঁয়ে থাকে। আঁকতে শুরু করি আমি। এই সময় আমার স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। বড়োবড়ো চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে - 'এই, কী করছো তোমরা?' বেশ অবাক হয়েছে ছোটো শিশুদের মতো মেঝেয় বসে আঁকতে দেখে। স্ত্রীর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারি না আমি। আমি শুধু এঁকেই চলি। রবার্ট উত্তর দেয়, ও বলে-
'আমরা ক্যাথিড্রাল আঁকছি।'
আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রবার্ট বলে-

‘এই, এখানে রেখাটি একটু মোটা করে দাও! হ্যাঁ, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, সুন্দর হয়েছে...। আঁকতে পারছো না?’

আমি আর্টিস্ট না হয়েও দিব্যি এঁকে চলেছি।

রবার্ট হেসে বলে-

‘ক্যাথিড্রালে মানুষ না থাকলে কি হয়? কিছু মানুষের ফিগার যোগ করো!’

এই সময় আমার স্ত্রীর কথা শুনতে পাই। অবাক হয়ে রবার্টকে প্রশ্ন করে-

‘এই, এসব কী করছো রবার্ট?’

আমার স্ত্রীর প্রশ্ন রবার্টের কানে যেন পৌঁছায় না। আমাকে নির্দেশ দেয়-

‘চোখ বন্ধ করো!’

ওর কথা শুনে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চোখ বন্ধ করি।

‘চোখ বন্ধ করেছো তো? একটুও ফাঁকিবাজি করো না।‘ - রবার্ট বলে।

‘না না, কোনো ফাঁকিবাজি নয়। সত্যিই চোখ বন্ধ!’ আমি বলি।

‘আঁকা থামিও না। চালিয়ে যাও।’

বুঝতে পারি রবার্ট ওর হাত আমার হাত থেকে সরিয়ে নিয়েছে। আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন এক অবাস্তব বাস্তবতায় হারিয়ে গিয়েছি। এঁকে চলি। কিছুক্ষণ পরে শুনতে পাই রবার্ট বলছে-

‘এঁকে ফেলেছো, দ্যাখো কী এঁকেছো, চোখ খুলে দ্যাখো এখন!’

আমার চোখ খুলে দেখতে ইচ্ছে করছে না। বুঝতে পারছিলাম আমার নিজের বাড়ির লিভিং রুমে বসে আঁকছি। বন্ধ চোখের রেটিনায় আমার আঁকা ক্যাথিড্রাল ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিলো।

শুনতে পাই রবার্ট প্রশ্ন করছে-

‘দেখতে পাচ্ছো?’

ওর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে ইচ্ছে করলো না। চোখ বন্ধ করে অনাদিকাল শুধু আঁকতে ইচ্ছে করছিলো।

*****

অন্তরালে

রুমানা আক্তার
ডেপুটি ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্সেস
ব্যাবিলন গ্রুপ

ঘুম থেকে উঠে হাতে এক কাপ চা নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসে মেঘলা। দিনের বাকিসময়গুলো অন্যদের জন্যে বরাদ্দ থাকলেও সকালের এই মুহূর্তটুকু শুধু তার নিজের জন্যে। চা খেতে খেতে সারাদিনের একটা প্ল্যান করে নেয় সে। আজকে অবশ্য তার চা শেষ হবার আগেই কলিংবেল বাজে, আলেয়া খালা এসে গেছে। খালাকে নাশতা বানাবার নির্দেশনা দিয়ে মেঘলা চলে যায় শাওয়ার নিতে। আজ শাড়ি পরবে সে।

আলমারি খুলে মেঘলা যখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ঠিক কোন শাড়িটা পরবে তখন পেছন থেকে দুটি হাত এসে আলতো করে জড়িয়ে ধরে তাকে।

- কী ব্যাপার! আজ এতো সকালে ঘুম ভেঙে গেলো যে!
- মিটিং আছে, আজকে একটু সকালেই বেরোতে হবে। যাবার সময় তোমাকে ড্রপ করে যাবো, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও।

বলে ওয়াশরুমের দিকে যেতে গিয়ে ফিরে তাকায় রবিন –

- কোন শাড়িটা পরবে তাই ভাবছো তো?
- হুম
- সাদা পরো, সাদাতে ভীষণ স্নিগ্ধ সতেজ লাগে তোমাকে।

ওপরের তাকে থাকা সাদা শাড়িটা হাতে নেয় মেঘলা। হাতে বোনা তাঁতের শাড়ি, মেরুন রঙের পাড়। রবিনই কিনে দিয়েছিলো গত মাসে।

ঝটপট শাড়ি পরে নেয় সে, চোখে পরে কাজল আর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। এমনিতে সে এমন কোনো সুন্দরী নয়,

তবে শাড়ি পড়লে তাকে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু অন্য রকম লাগে মেঘলার, মনে পড়ে গতরাতে বিশেষ মুহূর্তের সময় ওর নাকফুলে লেগে রবিনের ঠোঁট কেটে যায়। তাই নাকফুলটি খুলে রাখা, বহুদিন পরে নিজেকে নাকফুল ছাড়া দেখতে একটু কেমন যেন লাগে। হঠাৎ মেঘলার মনে হয়, আচ্ছা রিতুর নাকফুলে লেগেও কি কখনো রবিনের কোথাও কেটেছে? রিতু কি নাকফুল পরে? আধুনিক মেয়ে সে, নাও পরতে পারে।

- কী হলো? এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছো যে! আজকাল তোমার হয়েছেটা কী, প্রায়ই দেখি এরকম আনমনা হয়ে থাকো। কারো প্রেমে-টেমে পড়োনি তো আবার?

শাওয়ার শেষে অফিসের জন্য তৈরি হতে হতে বললো রবিন।

দ্রুত নাশতা শেষ করে খালাকে বাকি কাজগুলো বুঝিয়ে দিয়ে মেঘলা বেরিয়ে পড়ে রবিনের সাথে। সে কাজ করে একটা আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থায়, এখানে সেখানে মাঠ পরিদর্শন লেগেই থাকে। রবিন তার স্বামী, একটা বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত। এমনিতে প্রতিদিন রবিন তাকে অফিসে নামিয়ে দেয় না। মেঘলার অফিস শুরু হয় সকাল ৮ টায়, আর রবিনের ১০ টায়। দুজনার অফিসই অবশ্য গুলশানে। বিয়ের পর পর প্রায় দিনই ওরা অফিস থেকে বেরিয়ে একসাথে লাঞ্চ করতো। আর এখন চারটা বছর পার হতে না হতেই ... কথারা ফুরিয়ে গেছে, দুজনার একান্ত বলে যেন কিছু আর নেই। তাই ছুটির দিনগুলিতে বন্ধুদের বাসায় ডেকে নেয় ওরা, নিজেদেরকে সহজ করতে।

নীরবতা ভাঙে মেঘলা –

- নেক্সট উইকে আমি থাকবো না, কক্সবাজার যাবো।

- ফিল্ড ভিজিট, আবারো! আচ্ছা, মেঘা, তোমার কি মনে হয় না এবার আমাদের একটা বাচ্চা নেয়া উচিত, সংসারটা আরেকটু বড়ো করা উচিত? তুমি যদি ক্যারিয়ার আর সংসার এক সাথে ম্যানেজ করতে না পারো তাহলে জব থেকে একটা ব্রেক নাও, আমিতো আছিই।

- দ্যাখো রবিন, অফিস যাবার সময় আমি এসব নিয়ে কথা বলতে চাই না। তবু বলছি, তুমি কি আদৌ আমাদের এই সংসারটা টিকিয়ে রাখতে চাও?

- তার মানে? কী বলতে চাইছো তুমি?

- আমি বলতে চাইছি তুমি বিষয়টা নিয়ে আরেকটু ভাবো, ট্যুর থেকে ফিরে এসে তোমার সাথে কথা বলবো আমি।

মেঘলার তুলনায় রবিন দেখতে সুন্দর, রীতিমতো বর্তমান সময়ের মেয়েদের হার্টথ্রব, 'টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম'। তাই হয়তো সুন্দরের প্রতি ওর দুর্বলতা প্রবল। গত ছ'মাস হয় রিতু ওর টিমে জয়েন করেছে। স্মার্ট, শিক্ষিতা, প্রাণবন্ত রিতু – খুব সহজেই রবিনের নজর কেড়েছে। বুদ্ধিমতী রিতুও বসের দৃষ্টি পড়ে ফেলতে দেরি করেনি। তারপর কফিশপে, অফিস ট্যুরে বাড়তে

থাকে দুজনের ঘনিষ্ঠতা। অফিসেও এ নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়।

সেদিন রবিনের এক অফিস পার্টিতে ওর কলিগ মেঘলাকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চায় এসব। তখন দূর থেকে ভালো করে রিতুকে খুঁটিয়ে দেখে মেঘলা। মানতেই হয় মেয়েটা ভীষণ সুন্দরী, মায়াকাড়া মুখ, আকর্ষণীয় ফিগার, পোশাকের ব্যাপারেও খুব সচেতন – মানে রবিন যেমনটা পছন্দ করে আর কি। মেঘলা ভাবে শেষপর্যন্ত কি এই মেয়েটির কাছেই হেরে যাচ্ছে সে। রবিনকে এতোটা ভুল চিনলো ও! আরে ধুর, কী যা তা ভাবছে, রবিন এমনটা মোটেও না!

তারপর একদিন ওদের পাশের ফ্ল্যাটের ভাবি ওকে বলে –

- ভাবি আপনিতো প্রায়ই ট্যুরে যান, আপনার বাসায় কি কোনো ক্যামেরা সেট করা আছে?

- ক্যামেরা লাগবে কেন ভাবি, আমি ট্যুরে গেলে তো আলেয়া খালাও আসে না। রবিন তো শুধু রাতে ঘুমাতে আসে, আবার সকালে অফিসে চলে যায়।

- না মানে, কিভাবে যে বলি আপনাকে, ভাবি। আসলে গতবার যখন আপনি ছিলেন না তখন রবিন ভাই এর সাথে একটা মেয়েকেও আপনার বাসায় আসতে দেখেছিতো। আমার মনে হয়, ভাবি, আপনার আরো একটু খেয়াল রাখা উচিত।

- আপনি খেয়াল রাখছেন তো, তাতেই হবে।

অনেকটা মেজাজ খারাপ করেই উঠে যায় মেঘলা। তবে সেদিন রাতে ওর মনে পড়ে, সেবারে ট্যুর থেকে ফিরে বিছানার উপর কয়েকটা লম্বা চুল দেখতে পেয়েছিলো সে, কালার করা চুল। ড্রেসিং টেবিলে পড়েছিলো একজোড়া ইয়ারিং, আর ঘরজুড়ে ছিলো এক অচেনা মেয়েলি পারফিউমের সুবাস। তবে কেন জানি ওসব নিয়ে রবিনকে প্রশ্ন করতে রুচি হয়নি মেঘলার। একটা সন্দেহ কিন্তু থেকেই গেছে। কিছু একটা ঘটছে।

আর তারপরে অনেকটা প্ল্যান করে এবারের অফিস ট্যুরটা নেয় সে।

রবিনকে সে বিয়ে করেছিলো বাবার পছন্দে, নিজেরও অন্য কোনো পছন্দ না থাকায় আপত্তি ছিলো না তেমন। এখন বিষয়টা জানতে পারলে বাবা ভীষণ কষ্ট পাবেন – ভাবে মেঘলা। তবে অকাট্য প্রমাণ ছাড়া রবিন কিছুতেই স্বীকার করবে না এটা। সেজন্যেই এই ট্যুরের নাটকটা সাজানো।

যথারীতি মেঘলা ট্যুরের নাম করে ব্যাগ গুছিয়ে রওনা হয়। এবার অপেক্ষার পালা – একটা ফোন কলের অপেক্ষা। সেদিন সন্ধ্যায় কলটা আসে – মেঘলাদের বাসার সিকিউরিটি গার্ডের।

সে জানায় কিছুক্ষণ আগেই রবিন মেয়েটাকে নিয়ে তাদের বাসায় ঢুকেছে। ব্যস, মেঘলাও রওনা হয়ে যায় বাসার উদ্দেশে। কলিংবেল বাজাতে গিয়ে কী ভেবে মেঘলা ব্যাগ থেকে চাবি বের করে। যা ভেবেছিলো তাই, রবিন কখনোই সামনের দরজার ছিটকিনি তোলে না। চাবি ঘোরাতেই খুলে যায় দরজা।

বেডরুম থেকে ওদের দুজনের কথা ভেসে আসে – দুরুদুরু বুকে, দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে সেদিকে এগিয়ে যায় মেঘলা। দরজা হালকা ভেজানো, একটু ঠেলতেই ওদের দুজনকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখতে পায় সে। দেরি না করে হাতে থাকা মোবাইলে চটপট ওদের কয়েকটা ছবি তুলে নেয়। রবিন প্রথমে মেঘলাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে, কিন্তু পরে সামলে নিয়ে মেঘলার পিছু পিছু ছুটে আসে ও লিভিং রুমের সোফাতে এসে বসে। বুক ভরা ব্যথা নিয়ে লিভিং রুমের পেইন্টিং এর দিকে তাকিয়ে থাকে মেঘলা। মাত্র ক'মাস আগে এই ফ্ল্যাটটি কিনেছে ওরা, কত যত্ন করে সবকিছু সাজিয়েছে সে। অথচ কী সহজেই তার এতো সাধের সাজানো ঘরখানা ভেঙে যাচ্ছে, কতো সহজেই তার বাসাতে, তারই বেডরুমে অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে ঢুকতে পারে তার স্বামী!

মেঘলা বলে,

- তোমার কি কিছু বলার আছে, রবিন?

- আমি যাই বলি না কেন তুমি বিশ্বাস করবে না। মেঘা, আমাকে আরেকটিবার সুযোগ দাও, প্লিস। ইট উইল নট হ্যাপেন এগেইন।

- কী করে পারলে, রবিন! এটা আমাদের বাসা, আমাদের বেডরুম... আমাকে এরকম ভাবে চরম অপমান কীভাবে করতে পারো তুমি? কোন অধিকারে?

- মেঘা, প্লিস, দেয়ারজ নাথিং সিরিয়াস বিটুইন আস। কর্পোরেট দুনিয়ায় এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। উই আর নট ইভেন কমিটেড টু ইচ আদার! ইট ওয়াস জাস্ট ফর ফান্স সেক।

- রবিন, তুমি দয়া করে বাসা থেকে বের হয়ে যাও। তোমাকে ভীষণ ঘেন্না লাগছে আমার।

- মেঘা, প্লিস, ডোন্ট ক্রিয়েট এ সিন।

- সিন তো তুমিই ক্রিয়েট করেছো রবিন, তবে এর শেষটা অবশ্য আমিই করবো। এখন থেকে তোমার সাথে কথা বলবে আমার ল-ইয়ার।

দিন সাতেক পরে মেঘলা তার অফিসের পাশে এক রেস্তোরাঁয় দুটো কফি অর্ডার করে তার ল-ইয়ারের জন্যে অপেক্ষা করছে –

- এতক্ষণে আসার সময় হলো উকিল সাহেবের, সময়জ্ঞানের এতো অভাব হলে ক্লায়েন্টরা তো পালাবে!

- তুমিতো আমার পার্মানেন্ট ক্লায়েন্ট, পালাবার অপশন তোমার কোথায়!

মুচকি হেসে কথাটা বলেই মেঘলার পাশের চেয়ারে বসলো সজল- মেঘলার ডিভোর্স ল-ইয়ার এবং আগের অফিসের সহকর্মী।

- তারপর, বলো রিতুকে তোমার কেমন লাগলো? সেট-আপটা সুন্দর ছিলো না?

বললো সজল।

- হু, একটু বেশিই ভালো ছিলো। তা এই মেয়ের খোঁজ তুমি পেলে কোথায়?

- আমার এক ক্লায়েন্টের কাছে। তার আগে বলো, তুমি কী করে নিশ্চিত ছিলে যে রবিন এই টোপটা গিলবে?

- চার বছর একসাথে সংসার করেছি, মশায়, ওর টাইপ বুঝতে আমার ভুল হবে?

- যাক, তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের পথের কাঁটা দূর হচ্ছে।

- হু, পথের কাঁটাতো দূর হচ্ছেই, সজল।

- ডিভোর্সটা হয়ে গেলেই আমরা আমাদের বিয়েটা নিয়ে আগাবো, কি বলো?

- আসলে কি জানোতো সজল, রবিনকে আমি চিনি চার বছর ধরে আর তোমাকে চিনি সাতবছর ধরে।

- মানে? কী বলতে চাইছো তুমি?

- আমি বলতে চাইছি যে, এই কিছুদিন আগে তোমার নাটকের রোল প্লে করতে যেয়ে রিতু আমার বাসায় যে কানের দুলজোড়া ফেলে এসেছিলো, ঠিক একইরকম কানের দুল তুমি গতবছর আমাকে কিনে দিয়েছিলে ব্যাংকক থেকে। আমিতো ওগুলো আমার ভেবে তুলে রাখতে গিয়ে দেখি আমারটা আগের জায়গাতেই আছে। তুমি হয়তোবা ভুলে গেছো ওটার কথা, অথবা তুমি এই পুরো ব্যাপারটিকে কাকতালীয় বলে চালিয়ে দিতে চাইতেই পারো, তবে আমি বলি কী, চলো আমরা আরো কিছুটা সময় নেই।

- তার মানে?

- তোমাকে বলা হয়ে ওঠেনি, আমাকে ইউকে অফিসে বদলি করা হচ্ছে দু'বছরের একটি প্রজেক্টের জন্য।

- তা এই প্রজেক্টে তোমার সাথে কে যাচ্ছে? তোমার বস?

কফিটা শেষ করে একটি বাঁকা হাসি দিয়ে উঠে পড়লো মেঘলা।

- ব্লাডি স্লাট, বলে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে তুলে নিলো সজল।

*****

হারিয়ে যাওয়া বন্ধু

মোছা. লিমা খাতুন
প্রাক্তন জেনারেল অপারেটর, ট্রেনিং সেন্টার
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

জীবনে চলার পথে আমরা অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হই। সবার সাথে সব সময় কথা না হলেও কিছু মানুষ থাকে, যাদের সাথে একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্ত জুড়ে হয় কথা, ভালোবাসা। জীবনের এইসব মানুষগুলো যেমন সবসময় ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখে তেমনি তারা হারিয়ে গেলে আমাদের জীবনে নেমে আসে অঝোর ধারায় বৃষ্টি, অসীম কষ্ট আর বেদনার প্রহর। তখন যেন মনে হয় অযথা ভুল মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম।

আমার বান্ধবী, তার নাম ছিলো আয়েশা। আমি আর আয়েশা খুব ভালো বান্ধবী ছিলাম। দুজনে একসাথে চলতাম, একই স্কুলে পড়ালেখা করতাম। স্কুল ফাঁকি দিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতাম। রঙিন ঘুড়ির পিছনে ছুটতাম, নদীতে সাঁতার কাটতাম। আরও কত কী তা বলে শেষ করা সম্ভব না। আমরা দুজন দুজনকে কথা দিয়েছিলাম কখনো আলাদা হবো না। সব সময় এক সাথে থাকবো। আমার ছেলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দেবো, আমি বলতাম আয়েশাকে।

আমি আর আয়েশা যখন দশম শ্রেণিতে পড়ি, তখন হঠাৎ আমাদের দেশে এক ভয়ংকর মহামারি চলে এলো কোভিড-১৯, যাকে বলা হয় করোনা ভাইরাস। এতে করে গ্রামে অনেক তুলকালাম শুরু হলো। সবাই বলতে শুরু করলো এই রোগের কোনো ঔষধ নেই। যাকে একবার এই রোগ ধরে সে নাকি আর বাঁচে না।

এদিকে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে সরকার, এই মহামারির কারণে। সবাইকে ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। দুজনের বেশি তিনজনের সাথে চলতে নিষেধ করেছে। এই রোগ নাকি ছোঁয়াচে। একজনের থেকে অন্যজনের শরীরে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল বন্ধ, আমার আর আয়েশার যেন দম বন্ধ লাগছিলো এই সময়টায়।

তবে হ্যাঁ! আমরা ঘরে বসে থাকার মানুষ না। সময় পেলেই বেরিয়ে পড়তাম দুজন। মাঠ থেকে মাঠে দুজন ছোটাছুটি করতাম। প্রজাপতির পিছনে দৌড়াতাম, আরও কত কী! এর জন্য মায়ের কাছে রোজ রোজ বকা খেতাম। মা বলতো, ‘বড়ো তো

আর কম হোসনি! এখন একটু ঘরে মন বসা। ঠিক মতো পড়ালেখাটা কর।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! এভাবেই আমাদের জীবন খুব সুন্দরভাবে কাটছিলো। আমরা মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ, আরও দুইটা বোন আছে আমার। বাবাই আমাদের উপার্জনের একমাত্র ভরসা ছিলো। আমার বাবা একটা ব্যাবসা করতো। কিন্তু এই মহামারির কারণে ঠিক মতো ব্যাবসা হচ্ছিলো না। তাই আমি ঠিক করি ঢাকা যাবো, কাজ করবো। তাহলে একটু পরিবারের উপর চাপ কমবে। ঢাকা আসার আগের দিন আমার আর আয়েশার মধ্যে অনেক কথা হয়। আমরা কেউ কাউকে ভুলে যাবো না, রোজ ফোনে কথা হবে। এই রকম আরও অনেক কথা।

যেই বলা সেই কাজ, আমি আমার দূর সম্পর্কের এক বোনের বাসায় আসলাম। তারপর চাকুরি নিলাম ব্যাবিলন গ্রুপে। আমার আর আয়েশার মধ্যে রোজ কথা হতো। দেখা যেত বাড়িতে কথা না বললেও আয়েশার সাথে কথা বলতাম। হয়তো মন থেকে কাউকে ভালোবাসলে এমনটাই হয়। মানুষ বলে রক্তের সম্পর্ক না থাকলে নাকি কারো প্রতি এত টান হয় না। কিন্তু আমাদের মাঝে রক্তের টান না থাকলেও আমাদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা ছিলো। একজনের কষ্টে অন্যজন কষ্ট পেতাম। একজনের খুশিতে অন্যজন হাসতাম।

দিন এইভাবে ভালোই কাটছিলো। একদিন সকালে আয়েশা আমাকে ফোন দিলো। আমিই সাধারণত প্রতিদিন আয়েশাকে ফোন করি। সেদিন ও-ই আমাকে ফোন করলো। ফোন করে অনেক কান্না করছিলো। আমি বুঝতে পারছিলাম না কী হয়েছে। শুধু বলেছিলো নতুন কোনো বন্ধু বানিয়ে নিও। আমি বলেছিলাম ঠিক আছে বানাবো তবে তুই কোথায় যাচ্ছিস? উত্তরে আয়েশা বলেছিলো বিকেলে কথা বলবে। তারপর ফোন কেটে আমি অফিসে চলে যাই। কিন্তু আমার মন সেদিন কেমন যেন করছিলো। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার আর আয়েশার কাটানো সুন্দর সময়গুলো। সেদিন বিকেলে অফিস থেকে বাসায় ফেরার পর আয়েশার ফোনের আশায় আমি বসেছিলাম। ওর কাছ থেকে কোনো ফোন না আসায়, আমিও অভিমান করে ওকে ফোন করিনি। এভাবে বেশ কিছুদিন চলে যায়। সামনে মাহে রমজান তারপরই ঈদ। অনেক খুশি লাগছে, মনে মনে ভাবছি ঈদে বাড়ি গিয়ে আগে আয়েশার সাথে দেখা করবো। অনেক গল্প করবো দুজনে মিলে, কত কথা যে জমে আছে দুজনার!

ঈদে অফিস ছুটি হলো, বাড়ির জন্য রওনা হলাম। এক সময় বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। বাড়ির সবার সাথে দেখা হলো, কথা হলো। তারপর আমি ছুটে গেলাম আমার প্রাণপ্রিয় বান্ধবী আয়েশার কাছে। ওদের বাড়িতে গিয়ে মনটা আমার কেমন জানি হয়ে গেলো, ও বাড়ির সবাই যেন মন মরা। কারো মুখে এক ফোঁটা হাসি নেই। আমি গিয়ে আয়েশার আম্মুকে বললাম- 'আন্টি, আন্টি, আয়েশা কোথায়?' তখন আন্টি আমার হাত ধরে একটা কবরের পাশে নিয়ে দাঁড় করালো। কবরটি নতুন মনে হচ্ছে, বাঁশের বেড়াগুলো চকচক করছে। আমি বললাম- 'আন্টি, এটা কার কবর?' তখন আন্টি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না, এটা আমার কলিজার বান্ধবী আয়েশার কবর। জানতে পারলাম আয়েশার করোনা ভাইরাস হয়েছিলো। সাত দিন এই রোগে সে আক্রান্ত ছিলো। তারপর চলে যায় চিরদিনের জন্য না ফেরার দেশে।

আমি কিছুক্ষণ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বাড়ি চলে আসলাম। মানতে পারছিলাম না আয়েশার মৃত্যু। খুব কষ্ট হচ্ছিলো আয়েশার জন্য। কিন্তু উপরওয়ালার ইচ্ছে, কিছু করার নেই। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই এটাই আমাদের সবার মানতে হবে। আমার বোনের মতো বান্ধবীকে হারিয়ে তখন আমার পাগলপ্রায় অবস্থা।

সেই থেকে আমি আর কারো সাথে বন্ধুত্ব করি না। মনে হয় যার সাথেই বন্ধুত্ব হবে সেও হয়তো আয়েশার মতোই চলে যাবে। দোয়া করি পৃথিবীর সকল বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো ভালো থাকুক, দীর্ঘজীবী হোক। আমার আর আয়েশার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো স্মৃতির পাতায় থেকে যায়, কখনো বাতাসের গতি উল্টোপথে বইলে, সেই পাতাগুলোও উল্টে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

*****

হিম বসন্তের সহযাত্রী

সুবন পাথাং
অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

গল্প অনেক শুনেছি। পাওয়া না পাওয়ার গল্প। পাসপোর্ট জমা দেওয়ার আগে আমি ধরেই নিয়েছিলাম হয়তো পাবো না। বলছি ভারতীয় ভিসা পাওয়া না পাওয়ার কথা। সহকর্মীদের সাথে দুপুরে আহারের সময় আলাপচারিতায় তাই-ই গল্প হয়েছিলো, এখন ভারতীয় ভিসা আটকে দেয় অনেকবার ভারতে ভ্রমণরতদেরও। পাসপোর্ট জমা দেওয়ার প্রায় তিন সপ্তাহ পর মোবাইলে একটি ক্ষুদে বার্তা এলো, 'আপনার ভিসা আবেদনটি সম্পন্ন হয়েছে, দয়া করে পাসপোর্টটি সংগ্রহ করুন।' খুব উৎসাহ নিয়ে আমি পরেরদিনই গিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। কিন্তু আমার দলের আর কারও এখনও ভারতীয় ভিসার কোনও ক্ষুদে বার্তা মুঠো ফোন অবধি পৌঁছায়নি। যদিও তাদের বেশিরভাগেরই সম্ভাব্য তারিখ আমার ভিসা পাওয়া থেকে বেশ দূরেই আছে। কম করে হলেও অন্তত এক সপ্তাহের হের ফের।

৯ই এপ্রিল, ২০২৪ (রাতে)
যাত্রার দুইদিন আগেও ঠিক করতে পারিনি একসাথে যাবো কিনা। হঠাৎ সকলেই তাদের ভারতীয় ভিসা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে স্বস্তি দিলেন। এখন যাত্রার মূল বস্তু - যানবাহন ঠিক করা নিয়ে বাধলো বিপত্তি। বাস না নিয়ে নেওয়া হলো একটি হাইয়েস গাড়ি। ড্রাইভার ব্যতীত দশ আসনযুক্ত এই গাড়ি, যেখানে মানুষ ছাড়াও যে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও থাকবে সাথে তা বলাই বাহুল্য। যাত্রার বিরতি নিয়েছি বগুড়ায় পৌঁছে ভোর সাড়ে ৩টার দিকে। আমাদের সাথে একজন সহযাত্রী ছিলেন। ভদ্রলোকটিই একমাত্র মুসলিম ছিলেন আমাদের দলে, যিনি যাত্রা বিরতিতে সেহরি সেরে নিলেন। ভদ্রলোকটি বেশ রসিক। উনার সাথে পরিচয় হয়ে উনাকে একপ্রকার অবাক করে দিলাম যখন আমি বললাম আমি খ্রিস্টান। বাকিরা ছিলেন সবাই হিন্দু। সুতরাং দলে উনি একাই মুসলিম নন, আমিও একাই খ্রিস্টান বটে। ভদ্রলোকটির ডাকনাম রাজন। তবে ভালো হয়েছে এজন্য যে আমি ব্যতীত বাকিরা সবাই সবাইকে আগে থেকেই চেনেন এবং পূর্বেও এমন অনেক যাত্রায় তারা একে অপরের সহযাত্রী হয়েছেন। একদমই কাউকে চিনি না এমন নই, তবে এক দাদা আমার পূর্ব পরিচিত, যার মাধ্যমে এই দলে যুক্ত হওয়া। তিনি হলেন বিনয় দাদা। পথে যেতে যেতে সকলের সাথেই পরিচিত

হয়ে নিয়েছি। আমাদের দলটা মাঝারি আকৃতির, ৯ সদস্যের। দলের বেশিরভাগই মাঝ বয়েসি বলে মনে হলো। ভেবেছিলাম আমিই সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু দলে একজন বৌদি তার ছেলেকেও নিয়ে এসেছেন সাথে, যে কিনা সবেই বিশ ছুঁয়েছে। তার ডাকনাম সুপ্ত, সে তার বাবার ব্যাবসা দেখাশুনা করে। আর বাকিরা সব সাতত্রিশ, একচল্লিশ, চৌচল্লিশ, ছেচল্লিশ। হয়তো ভাবতে বসে গিয়েছেন যে সবার সাথে নাহয় পরিচিত হয়ে নিয়েছি তবে সবার বয়স আবার জানলাম কী করে! পরিচয় পর্বে অবশ্যই কেউ বয়স জানতে চাইবে না, যদি না নিজের থেকে বয়সে সবাই ছোটো হয়। গল্পের এক পর্যায়ে এর প্রসঙ্গ আসবে। তখনই নাহয় বলবো।

১০ই এপ্রিল, ২০২৪

স্থলবন্দরের সকল যাচাইপর্ব শেষে দুপুর গড়িয়ে বিকেল ৩টার দিকে পৌঁছে গেলাম শিলিগুড়ি। সেখানে পৌঁছে এসএনটি কাউন্টারে আর জিপ পাইনি। অবশেষে আমরা যেখানে যাবো ভারতের সিকিম রাজ্যের পেলিং শহরে, সেখানকার এক বয়স্ক কন্ডাক্টর ও সদ্য যুবক হয়ে ওঠা এক বালক ড্রাইভার পেয়ে গেলাম, যে আমাদের হোটেলে চেকইন অবধি থাকবে। প্রথমে বালক ড্রাইভার দেখে আমরা ভাবলাম এ কী চালাতে পারবে ঠিকঠাক! আমাদের ধারণা চূড়ান্ত ভুল প্রমাণিত করে সে চালাতে লাগলো একদম হাতপাকা চালকের মতোই। একের পর এক পাহাড়ি বাঁক আসে আর সে দক্ষতার সাথে হর্ণ বাজিয়ে নিশ্চিত করে দেয় আমরা আসছি। অবাক হলাম এই দেখে যে একটি ছোটো জিপকে একটি বড়ো ট্রাক যে কিনা ট্রাকের গতি হ্রাস করে পথ ছেড়ে দেয় যাওয়ার জন্য। ভাবছিলাম আমাদের দেশে হলে এতোক্ষণে হয়তো কে আগে যাবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত যা খুবই বিপদজনক। আরেকটা বিষয় খেয়াল করে দেখলাম, সিকিমের প্রত্যেক ড্রাইভার একে অপরকে ভালো করেই চেনে। ট্রাক ড্রাইভার যেমন চেনে জিপ ড্রাইভারকে, আবার জিপ ড্রাইভার চেনে প্রাইভেট কার ড্রাইভারকে, যেন একটা ড্রাইভারের পরিবার। সিকিমে বসবাসরত সকল অধিবাসীদের বলা হয় সিকিমিজ। তাদেরকে এখানে যাতায়াত একটু বেশিই করতে হয়। ঘর থেকে দোকান, শপিং মল দূরে তাই সকলেরই এখানে নিজস্ব গাড়িও আছে। প্রায়ই এরা নিজেদের সিকিমি ভাষায় আলাপ করে। শুনে কিছুটা হিন্দি ও বাংলার কোনও রূপান্তরিত ভাষা বলে মনে হয়। ওদের নিজেদের আলাদা পতাকাও আছে। প্রথমে দেখে মনে হবে যেন নতুন আরেকটি দেশে চলে এসেছি। নতুন দেশই বটে। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীনের সময় সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। পরবর্তীতে ১৯৭৫-এ শতকরা ৯৭ শতাংশ সিকিমের জনগণের ভোটে সিকিম ভারতের অংশ হয়ে যায়। এটি ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম প্রদেশ। এই

অঞ্চলের চারপাশে চারটি দেশ। উত্তরে চীন, দক্ষিণে বাংলাদেশ, পূর্বে ভুটান এবং পশ্চিমে নেপাল।

সিলিগুড়ি থেকে যতই উপরে উঠছি ততই আবহাওয়া বীভৎস গরম থেকে কোমল ও শীতলতর হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি শুরু হবে, ফোঁটা ফোঁটা পড়ছেও বটে। এই দেখে আমাদের সদ্য যুবক ড্রাইভার জিপটিকে রাস্তার পাশে পার্কিং করে বড়ো এক পলিথিন শিট দিতে উঠলো জিপটির ছাদে রাখা ট্রলি ব্যাগগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। মেলি চেক পোস্টে গিয়ে আমরা হাজির হই বিকেল ৫টার দিকে। সূর্য তখন ছিলো কিনা বোঝার উপায় ছিলো না, কারণ আকাশ সর্বদাই মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। তবে দিনের আলো ছিলো। মেলি চেক পোস্ট-এ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ হতে সিকিমে যাওয়ার একটা দাপ্তরিক অনুমতি নিতে হলো। সকলকে একটি করে পাসপোর্টের ফোটোকপি, ভিসার ফোটোকপি ও পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি সেখানে জমা দিতে হলো। দলনেতা শ্যামল দাদা যাত্রা শুরুর পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, তাই সকলেই সাথে করে এগুলো দশ কপি করে নিয়ে এসেছিলেন। সকলের পাসপোর্ট আবার জমা দেওয়া হলো। আনুমানিক দশদিন থাকবো এমন এক অনুমতি বাবদ সিকিম এন্ট্রি সিল সমেত আমাদের পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হলো। অনুরূপ এমন আরেকটি সিল নিতে হবে সিকিম থেকে বের হবার সময়। সন্ধ্যা হয়ে আসে আর বৃষ্টি হতে থাকে। তবে বেশি না, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। এখানে পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টি প্রায়ই হয়। সেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মাঝেই একটি চা বিরতিতে থামানো হলো জিপ। ছোটো একটি দোকান, উপরে টিনের ছাউনি, দোকানের ভিতরে এক পাশে বিছানা। বুঝতে বাকি রইল না, এটাই তাদের বাড়ি, এটাই তাদের দোকান। বেশিরভাগই এখানে পারিবারিক ব্যাবসা করে থাকেন। বাড়ি দেখে তেমন বুঝতে পারলাম না তারা ধনী নাকি মধ্যবিত্ত। তবে বাহিরে নিজেদেরই দুটো গাড়ি রাখা আছে। যা দেখে ধনী বলেই মনে হলো।

চা বিরতি শেষে হোটেলের গন্তব্যে রওনা শুরু হলো। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির আবহাওয়া ও বাংলাদেশের আবহাওয়া প্রায় একই রকম গরম। তবে এখানে জিপ যত উপরে উঠছে ততই ঠান্ডা বাড়ছে। সকলেরই আগে থেকে জানা ছিলো যে এখানে ঠান্ডা একটু বেশিই পড়ে, তাই প্রত্যেকেই কিছু না কিছু শীতবস্ত্র সাথে করে নিয়েই এসেছিলেন। এরই মধ্যে অনেকেই তাদের সাথে করে নিয়ে আসা শীতবস্ত্র পরিধান করতে শুরু করে দিয়েছেন। ভাবা যায়, এত গরমে হা হুতাশ করে করে ঢাকা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে এলাম এখানে, এখন কিনা শীতবস্ত্র গায়ে! ভাবছিলাম এমন দৃশ্য দেশে বসবাসরত মা-বাবাকে একটা পাঠালে কেমন হয়! তবে আমার শীত কমই লেগেছে। কী জানি হয়তো বয়স বাকিদের তুলনায় কম বলে অথবা জিপের জানালাগুলো

সব বন্ধ ছিলো বলে! সকলেই সাথে করে শীতবস্ত্র নিয়ে আসার একটাই কারণ, তুষারপাত দেখার আশায়। দলের সর্বকনিষ্ঠ সুস্তর তালিকায় যদিও শুরু থেকেই তুষারপাত দেখার জন্য শিশুভাব জাগ্রত ছিলো। তবে দলনেতা শ্যামল দাদা নিশ্চয়তা দিলেন যে যাত্রা শেষের আগেরদিন আমরা তুষারপাত অথবা ভূপাতিত তুষার হতে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে বরফের আস্তরণ দেখতে যাবো উত্তর-পূর্ব সিকিমে।

রাত্রি ৯টা ৩০ কী ৩৬ মিনিট, পৌঁছে গেলাম সিকিমের পেলিং শহরে। যে হোটেল বুক ছিলো, এখানে এসে দেখি বুকিং অর্থ পূর্বে পরিশোধ করা ছিলো না। যিনি এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি আমাদের দলনেতা শ্যামল দাদার এক দূরসম্পর্কের ভাই। শুনলাম ভদ্রলোক ব্যাঙ্গালরে বেশ ব্যস্ত ছিলেন, এদিকটায় আর নজর রাখতে পারেননি। অগত্যা আমাদের জিপে বসিয়ে শ্যামল দাদা আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে তার এক বন্ধু সেনতো দাদাকে নিয়ে চলে গেলেন হোটেলের খোঁজে। এখানে মোবাইলের সংযোগ ছাড়া তাদেরকে খুঁজে পাওয়াও মুশকিল হয়ে গিয়েছিলো। আধঘণ্টা পর দলে আমার যিনি পূর্বপরিচিত বিনয় দাদা, তিনিও চলে গেলেন তাদেরকে খুঁজতে। পাঁচ-সাত মিনিট বাদে ওরা সবাই একসাথে ফিরে এলো। পরে আমরা সকলে গিয়ে তাদের পছন্দ করা হোটেলে গিয়েই চেকইন করলাম।

হোটেলটা বেশ বড়ো সড়ো বটে তবে কর্মচারীর সংখ্যা খুবই কম, মানুষও কম আসে এখানে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে পুরো হোটেল জুড়ে একটাও ফ্যান বা এসি কিছুই পেলাম না, বরং গায়ে মোটা সোয়েটার জড়াতে হলো। তার আগে স্নানঘরে গিয়ে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে উষ্ণ জলে স্নান সেরে নেওয়া হলো। তিনটি রুম বুক করা হয়েছে। যার একটি নিচতলায়, দুটো রুমে বিভক্ত ও বাকি দুটি চার তলায়। আমরা নয়জনের চারজন- আমি, বিনয় দাদা, উনার বন্ধু সেনতো দাদা এবং রাজন ভাই ছিলাম একসাথে নিচতলার রুমে। শ্যামল দাদা ও বাকিরা চারতলার দুটি রুমে। এবার সান্ধ্যভোজের পালা। রাত ১০টা ৩০ মিনিট, বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। খাবারের হোটেলও আর পেলাম না। মেনুটা জানিয়ে দিয়ে আমাদের চেকইন করা হোটেলেই খাবার রান্নার ভার দেওয়া হলো। জায়গাটা যেমনই হোক, হোটেলেই বাঙালি খাবার ভাত, চিকেন, ডাল, সবজি, পাপড় ভাজা এসব পেয়ে সকলেই বেশ স্বাচ্ছন্দেই ভোজন করেছেন। রাত বেশি হয়ে গিয়েছে, ক্লান্ত শরীর, তাই প্রত্যেকেই যে যার মতো করে রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরের তিনদিন সিকিমের বেশ কিছু স্থান পরিদর্শন করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশৃঙ্গের উচ্চস্থান দেখা, পেলিং-এর স্কাই ওয়াক, রিমবি ওয়াটারফল-নদী-অরেঞ্জ গার্ডেন, খেচুপেরি লেক,

কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটারফলে জিপ-লাইনিং, সিংশোর ব্রিজ (এশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম ঝুলন্ত ব্রিজ), ডেনথাম ভ্যালী ভিউ পয়েন্ট, পশ্চিম সিকিমের ছোটো শহর লেগশিপের কিরাটেশ্বর মহাদেব মন্দির, রাবাংলা (রাভাংলা উদ্যান, বৌদ্ধ পার্ক), টেমি টি গার্ডেন, সেমদ্রুপ্‌ত্‌সি (Samdruptse), নামচি (দার্জিলিং-এর পাশে), সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক ও এর জনপ্রিয় সড়ক এম.জি. মার্গ।

১৪ই এপ্রিল, ২০২৪

পহেলা বৈশাখ বাংলা ইতিহাসের একটি প্রাচীনতম ঐতিহ্য। এই দিনটি প্রতিবারই বন্ধুদের সাথে ঘুরে অথবা পান্তা-ইলিশ খেয়ে উদযাপন করে থাকি। সিকিমের গ্যাংটকে এবার তা করার সুযোগ হলো না। এমনকি এই একটি দিনে বেশিরভাগই আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে আজ পহেলা বৈশাখ।

আমাদের আজকের গন্তব্য সিকিমে আসা অনেকেরই অধীর আগ্রহের প্রাপ্ত ফল। উত্তর-পূর্ব সিকিমের সোমগো লেক, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা ১২,৪০০ ফুট। আজকে আমরা আর সকালের নাস্তা সম্পন্ন করে বের হইনি। পথে যেতে যেতে রাস্তার পাশেই ছোটো একটি পারিবারিক রেস্তোরাঁ থেকে নাস্তা সেরে নিয়েছি। শুধু আমরাই নই, অনেকেই এসময় এখানে নাস্তা সেরে নিয়েছেন। আমাদের সাথে আজকে জিপের ড্রাইভার ব্যতীত একজন ট্যুর গাইড-ও আছেন। লোকটি বেশ যুবক। পরিচয়ে জানতে পারলাম উনি আইন নিয়ে সিকিমের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন এবং এর পাশাপাশি পড়াশুনার ফাঁকে সময় পেলে ট্যুর গাইডের কাজও করেন। কিছু সিকিমিজ নারী হাতে একটি ব্যাগে করে ৫০০ মি.লি. অক্সিজেন ভর্তি একটি বোতল বিক্রয় করছিলেন। এতো উচ্চতায় শ্বাসকষ্ট রোগী অথবা সাধারণ ব্যক্তিও অক্সিজেন স্বল্পতায় ভুগতে পারেন। কারো কারো নাক দিয়ে রক্তপাত, মাথা ব্যথা, বমি ভাবসহ বিভিন্ন প্রকার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই অনেকেই তা ক্রয় করে নেয়।

জিপ চলতে শুরু করলে একজনের হাতে আমি সোমগো লেকে প্রবেশের একটি অনুমতিপত্র দেখলাম। পরে দেখবো এই ভেবে আমি মোবাইল দিয়ে সেটার একটা ছবি তুলে নিলাম। সেখানেই সবার নাম ও বয়স উল্লেখ করা ছিলো। জিপ আরো উপরে উঠে চলেছে আর আমাদের কান বন্ধ হয়ে আসছে। বেশি উচ্চতায় অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে বলে শ্রবণশক্তি কিছুটা হ্রাস পায়। কিছু দূর যেতেই আমাদের চোখে ভাসতে লাগলো পাহাড়ের গা ঘেঁষে সাদা মতো তুলার স্তুপ। অনেকে হয়তো বলবেন এটা মেঘ। এতো উপরে মেঘ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কিন্তু মেঘ এমন স্তুপ হয়ে থাকবে না। একসাথে ঘন কুয়াশার মতো ভাসতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এটি পাহাড়ে তুষারপাত

জমে থেকে এমন রূপ নিয়েছে। দেখে মনে হবে জলরঙে আঁকা শিল্পীর হাতের এক অনন্য সৃষ্টি। আরও কিছু পথ গিয়ে দেখা গেলো প্রধান সড়কের পাশে তুষার হতে সৃষ্ট বরফ জমে আছে। এখানে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেক কম থাকে। তাই বরফ সহজেই গলে গিয়ে পানি হতে পারে না।

একটি স্থানে গিয়ে জিপ থামলো। সকলেই নেমে একটি কুটির ঘরের মতো দোকানে ঢুকলেন। আমি কৌতূহল বশত রাস্তার পাশে জমে থাকা তুষারের স্তূপ অনাবৃত হাতে কিছুটা নিয়ে দেখলাম। মনে হলো এটা বরফের থেকে কিছুটা কোমল ও স্বল্প ঠান্ডা। জিপ থেকে এসব তেমন কিছুই বোঝা যায়নি। পাশে একটু উঁচু হয়ে থাকা তুষার স্তূপে তিনটি কুকুর খেলা করছে। আমিও বাকিদের সাথে কুটির ঘরের মতো দোকানে গিয়ে যুক্ত হলাম। আমরা সবাই যদিও মোটা সোয়েটার পরে ছিলাম তবুও আমরা আরো একটি জ্যাকেট ভাড়া নিলাম, সাথে বুট ও হাত মোজা। সকলের পছন্দ মতো জ্যাকেট গায়ে নিয়ে আমরা আবার জিপে চড়ে বসলাম।

এবার মনে হলো জ্যাকেটের জন্য আমাদের শরীর কিছুটা মোটা হয়ে গিয়েছে। জিপে একটু গাদাগাদিও হলো। বেশিদূর যেতে হলো না। সোমগো লেক পৌঁছে গেলাম। জিপ থেকে নেমেই সকলে রাস্তার পাশের তুষার স্তূপে খেলা করতে শুরু করে দিয়েছেন। সামনে আরো পথ ছিলো যেখান দিয়ে নাথুলা পাস যাওয়া যাবে। নাথুলা পাস ভারতের সাথে চীনের সীমান্তবর্তী এলাকা, সেখানকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১৪,১৪০ ফুট উপরে। হেঁটে লেকের দিকে এগিয়ে যেতে শুরুতে চোখে পড়বে রোপ ওয়ে বা ক্যাবল কারের সিঁড়ি। আমরা সেখানে পরবর্তীতে চড়বো তাই আগে লেকের আশপাশ ঘুরে দেখা হলো। চারপাশে বরফঘেরা পাহাড় আর মাঝে বিশাল এই লেক। যেহেতু এতোদিন বসন্তকাল ছিলো তাই লেকের পানি খুবই স্বচ্ছ ছিলো। তবে লেকের পানি হিমায়িত ছিলো না। সেটা শীতকাল হলে দেখা যেতো। এক প্রকার লোমশ মহিষ দেখতে পেলাম। এটাকে বলে ইয়াক। এই ইয়াকের পিঠে চড়ে অনেকে লেকটি ঘুরে দেখেন।

বুট পরে বরফের উপর হাঁটতে এক অন্যরকম অনুভূতি হয়। কিছুটা মনে হবে যেন সমুদ্র হতে উত্তোলিত লবণের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। দলের অনেকেই বরফের পাহাড়ে উঠে গিয়ে ছবি তুলতে শুরু করে দিয়েছেন। সুপ্ত ও আমি আমাদের গাইডের সাথে পুরো লেকটি প্রদক্ষীণ করে বরফের পাহাড়ে উঠে চলেছি। ধীরে ও সন্তর্পণে এগোতে হয় নয়তো পা পিছলে পড়ে যাবার ভয় থাকে। বুক ভরা নিশ্বাস নিয়ে দেখলাম অক্সিজেনের অভাবে কোনো জটিলতা বা অস্বস্তি অনুভব করছি না। পাহাড়টির আর চূড়া অবধি গেলাম না। মাঝ বরাবর এসে সুপ্ত আর আমি বরফ ছোড়াছুড়ি করতে লাগলাম এবং আমাদের গাইড দাদা সেটা ভিডিও করে দিলেন। দুর্ভাগ্যবশত আমার মোবাইলে সেই ভিডিও আর খুঁজে পেলাম না।

পাহাড় থেকে নিচে নেমে আমি লেকের ধারে একটি ছোটো রেস্টহাউসে কিছুক্ষণ বসে লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। স্থানীয় লেক কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে এই লেকটি পবিত্র। তাই শীতকাল বাদেও অন্য কোনো সময়েও এর পানিতে নামতে বারণ আছে। একসময় আমরা সকলে আবার মিলিত হলাম জিপের সামনে এসে। তবে এখনি ফিরে যেতে কেউ চাইনি। আমি আমাদের দলনেতা শ্যামল দাদাকে বললাম- "ক্যাবল কারে তো এখনও চড়া হয়নি!" আমি একা বলে দাদা প্রথমে ইতস্তত করছিলেন, তবে আমার দেখাদেখি দলের অনেকেই এতে চড়তে রাজি হলেন। শেষে দলের নয়জন হতে একজন ব্যতীত আমরা আটজন দুটো ক্যাবল কারে চড়ে সোমগো লেকের আরো উপরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। ক্যাবল কারের টিকেট কাটতে লাইনে দাঁড়িয়ে অনেক বাংলাদেশিকেও দেখলাম। সুপ্ত তো এরই মধ্যে ওর চেনা একজনকে পেয়েও গেলো। ছয়জন করে ক্যাবল কারে চড়তে হবে। আমাদের দলের আটজনের ছয়জন পুরো একটি ক্যাবল কারে চড়ে গেলেন আর অপর আরেকটি ক্যাবল কারে আমি আর রাজন ভাই, অন্যান্য তিনজন বাঙালির সাথে তাদের দলের একজন গাইড। ক্যাবল কার চালু হওয়ার কয়েক মিনিটে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠলো। ক্যাবল কারটি যখন উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে, উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যের নিমিত্তে আর কিছুই টের পেলাম না। উপর থেকে এখন সোমগো লেক পুরোটা পরিষ্কার দেখা দিয়েছে। বাম পাশে আঁকা-বাঁকা পাহাড়ি পথ ও ডান পাশে সোমগো লেক। আর চারদিকে শুধু বরফে ঢাকা পাহাড়। একটি ক্যাবল কার হঠাৎ পাশদিয়ে নিচে নেমে গেলো। আমি দেখলাম দূরে আরো একটি সবুজ রঙের ক্যাবল কার উঠে আসছে। ঠিক মাঝ বরাবর এসে আমাদের ক্যাবল কারটি থেমে গেলো। খেয়াল করলাম দূরের ক্যাবল কারটিও

তখন থেমে আছে। আমরা তখন এটাকে বৈদ্যুতিক বিভ্রাট বলে ভেবে নিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে অর্ধেক পথে ক্যাবল কারটি থেমে যাওয়াটিও আমাদের ভালোই লাগলো। কারণ এতে করে যাত্রীগণ এই সুন্দর মুহূর্ত ফ্রেমে বন্দি করে নেবার সুযোগ পেলেন। পাঁচ মিনিট পর আবার ক্যাবল কার চলতে শুরু করেছে।

১৫-২০ মিনিটে আমরা উপরে উঠে গেলাম। সোমগো লেকের উচ্চতা ছিলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২,৪০০ ফুট উপরে আর ক্যাবল কারে চড়ে যে উচ্চতায় আমরা এসেছি সেটির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১৪,৫০০ ফুট উপরে। অর্থাৎ ক্যাবল কারে চড়ে আমাদের এলিভেশন গেইন হয়েছে আরো ২,১০০ ফুট। সারা এশিয়াজুড়ে এই ক্যাবল কারটিই সর্বোচ্চ উচ্চতার যাত্রী বহনকারী ক্যাবল কার। এই উচ্চতায় ঠান্ডার পরিমাণটা আরো বেড়ে গেলো। আমি পরিষ্কার অনুভব করছিলাম যে তাপমাত্রা ঋণাত্মক ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছে। হাতে মোজা ও পায়ে বুট না থাকলে এই তাপমাত্রায় টেকা আমাদের নাতিশীতোষ্ণ দেশের লোকেদের জন্য একটু জটিল হতে পারতো। এর অনুভূতিও আমি পেয়ে গিয়েছিলাম যখন হাতের মোজাটা খুলে মোবাইলে ভিডিও ধারণ করতে গেলাম। শৈত্যপ্রবাহ অনবরত হয়েই চলেছে। কিছুক্ষণ পর আমার মাথার উপর একটি পানির ফোঁটা পড়লো বলে মনে হলো। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তুষারপাত হবে হয়তো আর কয়েক মুহূর্ত পরেই। একটি বরফে ঢাকা সিঁড়ি দিয়ে নিচে বরফে হাঁটবো এই ভেবে নামতে গিয়ে হড়কে গিয়েছিলাম। মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়েছি সিঁড়ির হাতল ধরে। দেখলাম, দূরে বরফে ঢাকা পাহাড়গুলো এখন ছোটো ছোটো লাগছে। একটু ঝুঁকি নিয়ে ভিডিও করলাম। যে স্থানে নেমেছিলাম, তারই একদম কোণে কোনো প্রকার সুরক্ষা রেলিং ছিলো না। আমি গিয়ে বসলাম সেই কোণে। একটি ত্রিশ তলা বিশিষ্ট ভবনের ছাদের রেলিং -এর উপর পা দুলিয়ে বসলে যেমন লাগবে, আমার কাছেও ঠিক তেমনই মনে হয়েছিলো। মাত্র বিশ সেকেন্ড সেখানে বসেই উঠে গেলাম। শুনেছি সিকিমে অনেকেই অসাবধানতা বশত এমন কাজ করতে গিয়ে খাদে পড়ে হারিয়ে যান। আমিও তাই নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে ছাড় দিলাম না। আমাদের দলে যিনি আমার চেনা ছিলেন বিনয় দাদা, উনি কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, - "দাদা, আপনি এখানে হারিয়ে গেলে আপনার মাকে কী জবাব দিবো আমি!" অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলা উচিত। তাই বলে কেউ ঝুঁকি নিবে না, এমন তো নয়। বলতে পারেন আমি সাবধানে ঝুঁকি নিয়েছিলাম। তবে আমার দিক থেকে সর্বদা পরামর্শ থাকবে এসব ঝুঁকি নেওয়ার আগে একবার ভেবে নিবেন।

তুষারপাত শুরু হবে, তাই আমাদের ক্যাবল কারটি নিচে নেমে যেতে চাইছে। আমরা সকলেই পূর্বের ন্যায় উঠে পড়লাম ক্যাবল কারে। নামতে নামতে অনেকখানি ভিডিও করা হলো মোবাইল দিয়ে। দেখছি বৃষ্টি পড়ছে। আসলে কী এটা বৃষ্টি ছিলো! পরে ভাবলাম তুষারপাত শুরু হয়েছে। আবার ভাবলাম হয়তো এটা তুষার বৃষ্টি। এই ভাবতে ভাবতেই নিচে চলে এলাম এবং সকলে একত্রিত হলাম। আমরা সবাই বলছিলাম যেন নিচে গিয়ে তুষার বৃষ্টি পাই। কিন্তু হলো তো বিপরীত। নিচে পৌঁছে তুষারপাত কমে গেলো। যেটুকুই পেয়েছি তা-ই উপভোগ করার চেষ্টা করেছি। এরপর আমরা আর বেশিক্ষণ সোমগো লেকে অবস্থান করলাম না। জিপে করে চলে এলাম সেই স্থানে যেখান থেকে জ্যাকেট, হাত মোজা, বুট এসব নেওয়া হয়েছিলো। সেখানে পৌঁছে দেখি আরো এক পশলা তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। পূর্বের ন্যায় সকলেই আবার ভেতরে চলে গেলেন, শুধু রয়ে গেলাম আমি বাহিরে। বৃষ্টির মতো তুষারপাত দেখে আমার ভিজতে ইচ্ছে জাগলো। জ্যাকেট ছিলো রেইনকোটের মতো, তুষারে ভিজে না। আমি ভেতরে গিয়ে জ্যাকেট খুলে রেখে চলে এলাম আবার বাহিরে। এবার শুধু আমার মোটা সোয়েটার ছিলো গায়ে। দেখলাম তুষার আমার সোয়েটারে লাগছে কিন্তু ভিজছে না। এমন ঝুম তুয়ারপাতে আমার অনুভূতি ছিলো, কেউ যদি উপর থেকে তিনটা-চারটা করে মুড়ি এভাবে গায়ে ফেলে দেয়, ঠিক এমনই অনুভব হবে। আমি সেই মুহূর্তটার ভিডিও করে ভেতরে গিয়ে সবার সাথে একত্র হলাম। এখানেই আমাদের দুপুরের আহার করবার ব্যবস্থা করা হলো। সিকিমে বেশিরভাগ হোটেলে গিয়েই একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এখানে কেউ আগে থেকে কিছু তৈরি করে রাখে না, আপনার অর্ডার পাওয়ার পর অনেকে মিলে তা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আমরাও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে সকলেই খাবার খেয়ে নিলাম। মধ্যাহ্নভোজ শেষে সকলেই জিপে গিয়ে উঠলাম। যেতে যেতে আবারও বরফের পাহাড়ের দৃশ্য অবলোকন করতে করতে হোটেলের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

বাংলাদেশে ফেরার পথে দলের অনেকেই বলছিলেন, আর কখনও আসতে পারবো কিনা তা জানা নেই। তবে আমার মতে, সবার মাঝেই নিজ চোখে তুষারপাত দেখার যে একটি ইচ্ছে থাকে, আশাকরি প্রত্যেকেই তা কিছুটা হলেও পূরণ করতে পেরেছেন।

*****

বন্ধু

সাইদুর রহমান
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড
জুনিপার এমব্রয়ডারিজ লিমিটেড

বন্ধু হলো
তিনটি বর্ণের ব্যাকরণিক সন্ধি,
বন্ধু হলো
পৃথক দেহ একাত্মায় বন্দি।

বন্ধু হলো
গল্পের ঝুড়ি, যা হয় না কভু শেষ,
বন্ধু হলো
মনের মিলন, নেই হিংসা-বিদ্বেষ।

বন্ধু হলো
সুখের সাথি, সুখকে দেয় বাড়িয়ে,
বন্ধু হলো
দুঃখের সঙ্গী, দুঃখকে দেয় হারিয়ে।

বন্ধু হলো
ডাক্তার আমার
বন্ধু মনোবিদ,
বন্ধুর ছোঁয়ায় রোগ মুক্ত হই
বন্ধুত্বেই মনে হিত।

বন্ধু হলো
পাওয়ার হাউস, যে শক্তির যোগান দেয়।
বন্ধু হলো
ব্ল্যাকহোল, যে অপশক্তি শুষে নেয়।

*****

হ য ব র ল

মো. মজনু মিয়া
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কর্পোরেট ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স
অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

যেমন খুশি সাজছে সবাই,
কে যে রাজা কে যে সিপাই।
কার হুকুমে চলছে কে আজ,
অস্থিরতা সবখানে বিরাজ।

চাল, ডাল আর গোস্ত মাছে,
তাতে কি ভাই স্বস্তি আছে?
আলু, পেঁয়াজ ঠান্ডা হলে,
সয়াবিনে আগুন জ্বলে।

সব যেন আজ ছন্নছাড়া,
বিড়াল দিচ্ছে মাছ পাহারা।
ভূত তাড়ানো সরিষা মাঝে
ভূত মিলছে সকাল সাঁঝে।

লুটে-পুটে কেউ দেশান্তরী,
কেউবা দেশে অনাহারী।
চোখ বুজে তা সইছি সবে
কেউ কী উপায় বলে দিবে?

বিড়ালের গলে ঘণ্টা খানা
পরিয়ে দিবে সে কোন জনা?
আসলেই কি আছে কেহ?
যে জুড়াবে মোর যাতন দেহ!

কে মোড়লের ঘুম ভাঙ্গাবে,
চোখ খুলে সব দেখিয়ে দেবে।
লোক জন আর, নাই ভালো নাই!
ভালো থাকার রোগেই ভুগছি সবাই।

*****

অ-পে-ক্ষা

আশরাফুল আলম
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ডিস্ট্রিবিউশন
ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্স লিমিটেড

কবে পাবো সে উষ্ণ আলিঙ্গন,
তোমার বুকে আমার
নিষ্পেষিত স্পন্দন।

একমুঠো সুখ ছুঁয়ে যাবে
তোমাকে আমাকে,
নিয়ে যাবে এক মহা
প্রণয়লীলার দ্বারপ্রান্তে।

অপেক্ষা, শুধুই অপেক্ষা
সময় তো ফুরোয় না,
প্রত্যাশার বারুদ বুকে জমা
বিস্ফোরিত হয়নি এখনো,
তোমার স্পর্শে হবে
হয়তো চূর্ণ-বিচূর্ণ,
ভরিয়ে দেবে চারিপাশ।

আমি ক্লান্ত হবো না,
এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে
তোমারই অপেক্ষায়,
তুমি আসবে হয়তো
গোধূলি বেলায়,
ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে।

বুকে ঠাঁই নিলেই ক্লান্তি
যাবে চলে দূরে বহুদূরে,
আমি ঠায় দাঁড়িয়ে শুধু
তোমারই অ-পে-ক্ষা-য়।

*****

জীবনে প্রত্যক্ষ উত্থানপতনের কিছু গল্প ও তার বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ সাইফুল হক
প্রাক্তন এজিএম, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

আজ ৫ই আগস্ট, কিন্তু আমার হিসেবে ৩৬ শে জুলাই। জুলাই হত্যাকাণ্ডের পর থেকে আমি আগস্ট মাস না গুনে জুলাই-ই গুনে চলছিলাম। পরম পরাক্রমশালী ও একপর্যায়ে বেপরোয়া একটি শাসক গোষ্ঠী যে মাত্র ৩৬ দিনের মাথায় জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে, এটা কেউ ভেবেছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু বিধাতার বিচার সত্যিই অবাক করার মতো। যে নেত্রী ২০০৮ সালে বিপুল জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতায় আসেন, তিনি টানা তিনটি টার্ম তথা পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার পর চতুর্থ টার্মের মাত্র ৬ মাসের মাথায় অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হলেন। আমি জানি না বাকি জীবনে তার পক্ষে আর এই লজ্জা নিবারণ সম্ভব হবে কিনা। এই ঘটনা আমার জীবনের এক বিশাল শিক্ষা, যা আমাকে "ব্যাবিলন কথকতা"র জন্য কলম ধরতে উৎসাহিত করেছে। একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি তার একগুঁয়ে মানসিকতা ও অত্যধিক ক্ষমতালিপ্সার কারণে কিভাবে সফলতার চূড়ান্তে থেকেও পতন হতে পারে তা আজকের এই ঘটনা প্রমাণ করে। আমার পঞ্চাশোর্ধ বয়সে আজ এরকমই আরও কিছু ব্যক্তিগত ঘটনা যা কিনা মানুষকে জিরো থেকে হিরো বানিয়েছে, আবার স্খলনের কারণে হিরো থেকে জিরোতে নিয়ে গেছে, তা বলার অভিপ্রায়ে আজকের এ লেখা।

এবারে আমি গল্প করব একজন শিক্ষকের, যিনি আমার দৃষ্টিতে পেশাগতভাবে অনেক সফল ও সামাজিকভাবে সম্মানিত। অনিয়ন্ত্রিত টাকার নেশায় তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে ব্যাবসা ধরেন এবং প্রাথমিক সাফল্যও লাভ করেন। কিন্তু অতিরিক্ত নেশা তাকে দিনে দিনে বেপরোয়া করে তোলে। তিনি তার ক্লায়েন্টদের দেয়া কথা রাখতে পারেন না। অথচ তার জন্য কোনো অস্বস্তিও বোধ করেন না বরং নিজের ব্যর্থতা নানা ছলচাতুরিতে ঢাকার চেষ্টা করেন। তার শিক্ষকতার পেশা দশ বছরে যে খ্যাতি ও সম্মান দিয়েছিলো, তা নীতিহীন ব্যবসা করার কারণে প্রথম পাঁচ-সাত বছরে উন্নতি দিলেও পরবর্তী সময়ে তাকে জেলে পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এছাড়া বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের অভিশাপ তাকে উৎকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত করেছে। একসময় তিনি আমার কাছে জিরো থেকে হিরো হওয়ার একজন আইডল ছিলেন, আজ তিনি আমার কাছে একটি খারাপ অভিজ্ঞতা ও করুণার মানুষ।

এবার একজন ব্যাবসায়ীর কথা। যার মন প্রাণে ছিলো ব্যাবসা। একজন সৎ, পরিশ্রমী ও মেধাবী ব্যাবসায়ী হিসেবে পরিচিত জনের কাছে সমাদৃত। তিনি ব্যাবসায় যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেন অল্প সময়ে এবং ব্যাবসার পরিধিও বাড়াতে থাকেন। স্টাফ-সহকর্মীদের দক্ষতা, মর্যাদা ও বেতনবৃদ্ধির খেয়াল কম থাকলেও নতুন লোক নিয়ে তাদের কাছ থেকে ব্যাবসা সংগ্রহের নেশা ছিলো তার। ব্যাবসা হাতে এলে তিনি মাধ্যমকে উপেক্ষা করতেন অতিরিক্ত লাভের নেশায় ও লোভে। প্রথম দিকে তার কৌশলটা অনেকেই বুঝতে না পারলেও, পরে তা বুঝেছে। সুন্দর কথা, সহজ-সরল ভঙ্গিমা অন্য মানুষকে অল্পতেই নিবেদিত করে দিত এবং তিনি তার লক্ষ্য অর্জনের পর তাকে আর সহ্য করতেন না। এই বৈশিষ্ট্য সবার নিকট স্পষ্ট হলে তিনি ভালো ক্রেতা, নৈতিক ও মেধাবী লোক হারাতে থাকেন এবং তখন তিনি কোম্পানিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে কোম্পানি চালান। এতো বড়ো একটি প্রতিষ্ঠান অনেকটা নিয়ম-নীতি না থাকার কারণে অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ে। উপার্জনের তুলনায় খরচ বেশি হয় এবং তিনি চরম আর্থিক সংকটে পড়েন। সংকট দিনে দিনে এত গভীর হয় যে, তিনি কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন দিতে অপারগ হয়ে পড়েন। অনেক পার্টি সময়মত তাদের পাওনা না পাওয়ায় কাজ করতে অনিচ্ছুক হয়ে উঠে। অন্য কারোর সাথে সহজশর্তে কাজ করলেও ঝুঁকি সংযোজনী এই কোম্পানির প্রাপ্তি কমিয়ে দেয়। এছাড়া প্রতিনিয়ত জনশক্তির আগমন ও প্রস্থান প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কর্মবাহিনীর কাছে কোনো গ্রহণযোগ্যতা দেয়নি এবং কোম্পানি তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়ে। এরমধ্যে কোম্পানির সহযোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং সহযোগিতার অস্বীকৃতি জানায়। কোম্পানির কর্ণধার দিনরাত পরিশ্রম

করেও হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা তো দূরের কথা, কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখাই তার দায় হয়ে পড়েছে। আজ তিনি ব্যাংক, ব্যক্তি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিকট শত শত কোটি টাকার ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

এবার বলবো একজন মোয়াজ্জিনের উত্থান ও পতনের কথা। তিনি নিজে খুব ভালো কণ্ঠের অধিকারী ও হাফেজ ছিলেন। তার উপার্জন ছিল সীমিত, টিউশন ও বেতনের টাকায় তিনি সংসার চালাতেন। মানুষ তাকে ভালোবাসতো। তার খেয়াল হলো তিনি গ্রামে একটি বাড়ি বানাবেন সুন্দর করে। এজন্য পরিশ্রমও করতেন বেশ। কিন্তু তাতে তার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছিলো না। তাই তিনি নিজস্ব ইমেজ ব্যবহার করে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন কিন্তু তা আর সহজে ফেরত দিতে পারতেন না। ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক হলেও আচরণে কিছুটা বদরাগী ছিলেন। একদিন তার কোনো এক ছাত্রকে শাসন করতে গিয়ে এমন পিটুনি দিলেন যে বাবা-মা তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে মসজিদ কমিটিকে অভিযোগ দিলেন। তার সুন্দর কুরআন তেলাওয়াত সত্ত্বেও মসজিদ কমিটি তাকে চাকরি থেকে তাৎক্ষণিক অব্যাহতি দিলেন। আজ সে নিদারুণ কষ্টে পতিত হয়েছে।

আমাদের জাতীয় জীবনেও অনেক নায়ক, গায়ক, পেশাজীবী, মন্ত্রী, লোভে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে সমাজের উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে ঘৃণিত, অভিশপ্ত ও চরম অবমাননাকর জীবনে পতিত হয়েছেন। এসব নাম উচ্চারণ করে ব্যক্তিগতভাবে গোনাহের ভাগিদার হতে চাই না।

আমার এই লেখার উদ্দেশ্য একটাই। সামাজিকভাবে আপাত সফল, অহিংসুক নিরহংকার মানুষগুলো, যে কেবল লোভের কারণে ধ্বংস হচ্ছে তাই বলা। আর এই লোভ বহুমাত্রিক-কারো লোভ টাকা, কারো ক্ষমতা, কারো ভোগ-বিলাস। পরিশ্রমী, সৎ, শিক্ষিত, মানুষগুলো কিভাবে যে আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়, তা নিজের চোখে দেখা ঘটনা থেকে বলার চেষ্টা করলাম।

নিজের জীবনেও অনেক ভুল আছে। যার কারণে নিজেও প্রত্যাশিত লক্ষ্যচ্যুত হয়েছি। তাই নিজের ও সকলের প্রতি পরামর্শ হলো জীবনে নীতির চর্চা করা এবং সেই অনুযায়ী জীবনে চলার একটি আদর্শিক মান ধরে রাখা। ব্যক্তিগত লোভ, ক্ষোভ, অহমিকা, একগুঁয়েমিতা, নির্বুদ্ধিতা, স্বার্থপরতা, পরিহার করে আদর্শিক জীবন-যাপন করা। তাতে অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক প্রাপ্তি কম হলেও, আখেরে ভালো হয়। অন্তত চরম লজ্জা, গ্লানি ও ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচা যায়। সময় সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তা উপলব্ধি করা ও মেনে নেবার প্রত্যাশায় আমার এই কলম ধরা। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

*****

১২০ বাই ৮০

ডা. মো. দিদারুল করিম
মেডিক্যাল অফিসার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

লেখার শিরোনাম ও লেখকের নাম দেখে কিছুটা হলেও অনুমেয়, কী বিষয় নিয়ে লেখাটা লেখা হয়েছে। যখনই ব্যাবিলন কথকতার জন্য লিখতে যাই তখনই চিকিৎসা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা সবচেয়ে বেশি সামনে চলে আসে। বাংলায় একটা কথা আছে- "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে"। চিকিৎসা সংক্রান্ত ছাড়া অন্য কোনো কিছু যেন মাথাতে আসতেই চায় না। এই যেমন বর্তমান সময়ে মাথা ঘোরানো, ঘাড় ব্যাথা, শরীর দুর্বল রোগীদের চিকিৎসা কেন্দ্রে আগমন সবচেয়ে বেশি। বাম হাতটা একটু এগিয়ে দিয়ে বলে- "প্রেশারটা একটু মেপে দেন তো!" প্রেশার মেপে দিলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? ব্লাড প্রেশার নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত। আজকে লেখার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

প্রতিটি জীবিত মানুষের প্রেশার থাকে, প্রেশার নাই তো সে মানুষ মৃত। আমরা কাউকে তখনই উচ্চ রক্তচাপের রোগী বলি, যখন তার রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে। সাধারণ জনগণ স্বাভাবিক প্রেশার বলতে বোঝে, সিস্টোলিক প্রেশার (উপরের প্রেশার) ১২০ মিলি মিটার অফ মার্কারি ও ডায়াস্টোলিক প্রেশার (নিচের প্রেশার) ৮০ মিলি মিটার অফ মার্কারি, এটি সুস্থ মানুষের রক্তচাপের গড় মাত্রা। একজন সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ (১৮ বছরের উর্ধ্বে) একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রেশার মাপানোর পর যে প্রেশার পাবেন এবং সেই প্রেশারে ওই ব্যাক্তি কোনো রকম সমস্যা অনুভব না করলে এটিই তার স্বাভাবিক রক্তচাপ। যেমন- একজন ব্যাক্তির রক্তচাপ ৯০/৬০ এই প্রেশার নিয়ে উনি কোনো সমস্যা অনুভব করেন না। তাহলে এটিই তার স্বাভাবিক রক্তচাপ, এর চেয়ে বেশি হলে যদি তিনি সমস্যা অনুভব করেন, সেটি হবে তার জন্য উচ্চ রক্তচাপ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে উপরের প্রেশার ১০০-১৩০ হলে স্বাভাবিক, ১৩০-১৪০ হলে প্রাথমিক উচ্চ রক্তচাপ, ১৪০ এর বেশি হলে উচ্চ

রক্তচাপ আবার নিচের রক্তচাপ ৬০-৮০ হলে স্বাভাবিক, ৮০-৯০ হলে প্রাথমিক উচ্চ রক্তচাপ, ৯০ এর বেশি হলে উচ্চ রক্তচাপ বলে। রোগীরা যখন আমাদের কাছে আসে তখন খুব দ্রুত হেঁটে আসেন অথবা কোনো দুঃসংবাদ পেয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন এমন অবস্থায় আসেন। এ অবস্থায় প্রেশার না মাপাই ভালো। রোগীকে ৫ মিনিট চেয়ারে বসিয়ে রেখে চিন্তামুক্ত করে দুই হাত টেবিলের উপরে সমান্তরালে রেখে, দুই পা মাটির সংস্পর্শে এবং দুই পায়ের মাঝে কিছুটা ফাঁকা রেখে রক্তচাপ মাপতে হবে। মনে রাখবেন প্রেশার মাপার সময় নড়াচড়া করবেন না ও কথা বলবেন না।

এ অবস্থায় প্রেশার বেশি পেলে আপনি রোগীকে উচ্চ রক্তচাপের রোগী বলতে পারেন না। পর পর ৩ দিন তাকে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো চিকিৎসক রোগীকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে থাকেন। শোয়া, বসা, দাঁড়ানো, তিন অবস্থায় গড় প্রেশার যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয় তখনই আমরা রোগীকে উচ্চ রক্তচাপের রোগী বলবো। আমরা কি এই অবস্থায়ই ঔষধ শুরু করে দিই? না। রোগীকে প্রথম ৩ মাস কিছু কাজ দেই, যেমন- খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন (তেল-চর্বি, মশলাদার খাবার, গরু-খাসির মাংস, চিংড়ি মাছ, মাছের মাথা ও ডিম, কলিজা, মগজ, হাড়ের মজ্জা, ডিমের কুসুম, নারকেল ও নারকেলের তৈরি খাবার, ঘি, মাখন, বার্গার, পিৎজা, কেক, পুডিং, পেস্ট্রি, আইসক্রিম, ইত্যাদি বাদ দিতে হবে), চিন্তা ভাবনা কমাতে হবে, শারীরিক পরিশ্রম বাড়াতে হবে, ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা বাদ দিতে হবে, ডায়াবিটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, রক্তে চর্বি ও পরিমাণ বেশি থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

প্রেশার বেড়ে গেলে অনেকে তেঁতুল খান। তেঁতুল খেলে কি রক্তচাপ কমে? তেঁতুলে থাকে ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, যা রক্তচাপ কমাতে বা নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সাহায্য করে, তাই বলে তৎক্ষনাৎ কমাতে পারে না। অনেকে হাতের কাছে তেঁতুলের চাটনি না পেয়ে দোকান থেকে তেঁতুলের চাটনি কিনে নিয়ে আসেন। এটি আরও বিপদজনক, কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে চিনি, লবণ আরও অনেক ক্ষতিকর উপাদান। কেউ কেউ আবার তেঁতুলের চকলেট খান। এতে রয়েছে বিষাক্ত সিসা। তেঁতুল যদি প্রেশারই কমাতো তাহলে প্রতিটি প্রেশারের রোগীর বাড়িতে তেঁতুল গাছ থাকতো কিংবা প্রতিটি রোগীর জায়গা হতো তেঁতুল গাছের নিচে। তাহলে এত প্রেশারের ঔষধ আবিষ্কারের দরকার হতো না। আবার যাদের রক্তচাপ কম তারা স্যালাইন পান করলে কি রক্তচাপ বাড়ে? হ্যাঁ, স্যালাইন পান করলে

রক্তচাপ বাড়ে। কারণ স্যালাইনে থাকা সোডিয়াম রক্তচাপ বাড়ায়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া স্যালাইন পান করবেন না।

কোন মেশিনে প্রেশার মাপবেন? ডিজিটাল না অ্যানালগ মেশিনে? দুটোই ভালো। ডিজিটালে আপনাকে কারো সাহায্য নিতে হবে না, নিজেই নিজের প্রেশার মাপতে পারবেন এবং ডিজিটাল বিড়ম্বনাও পোহাতে হবে, যেমন- রক্তচাপ দেখাবে ১২১/৭৯, ১৩১/৮৯ এমন। আমরা সাধারণত ১০-১০ করে প্রেশার মাপি, যেমন-১২০/৮০, ১৩০/৯০, ইত্যাদি। ডিজিটাল মেশিনে অনেক সময় প্রেশার বেশি দেখায়, যা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা চিকিৎসকেরা অ্যানালগ মেশিনেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। মনে রাখবেন ডিজিটাল মেশিনে অ্যানালগ মেশিনের চেয়ে আনুমানিক ১০-এর মতো বেশি প্রেশার দেখায়। তাই প্রাপ্ত ফলাফল থেকে ১০ বাদ দিলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে। আমরা চিকিৎসকেরা অ্যানালগ মেশিনে প্রেশার মাপার সময় প্রেশারের গতি, শব্দ শুনে অনেক তথ্য পাই যা ডিজিটাল মেশিন থেকে পাওয়া যায় না। আপনার জন্য যেটা সুবিধাজনক আপনি সেটা ব্যবহার করবেন।

কখন প্রেশার মাপবেন? আপনি যখন চিন্তামুক্ত থাকবেন তখনই প্রেশার মাপবেন। অনেকেই বলেন প্রেশার উঠানামা করে। দিনের মধ্যে পারেন তো একাধিক বার প্রেশার মাপেন। এমতাবস্থায় চিন্তার কারণে আপনার প্রেশার আরও বেশি বেড়ে যায়। একে হোয়াইট-কোট সিনড্রোম বলে। ডাক্তাররা চেম্বারে রোগী দেখার সময় স্বাভাবিক পোশাকের উপর সাদা অ্যাপ্রোন পরে থাকেন। চেম্বারে যখন আপনি প্রেশার মাপাবেন তখন রোগীর মনের মধ্যে একটা চিন্তা কাজ করে, প্রেশারটা বাড়লো না তো? এরকম একটা অনুভূতি কাজ করে। এই অনুভূতিতেই প্রেশারটা বেড়ে যায়, আর এটিই হোয়াইট-কোট সিনড্রোম। কী কী উপসর্গ থাকলে বুঝবেন আপনার উচ্চ রক্তচাপ হয়েছে? মূলত ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কোনো উপসর্গ থাকে না। একে নীরব ঘাতকও বলা হয়। সাধারণত মাথা ঝিম ঝিম করে, দুর্বল লাগে, মাথা ব্যথা হয় এমন একটা অনুভূতি উচ্চ রক্তচাপের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে। আপনি চিকিৎসকের কাছে গেলেন চিকিৎসক প্রেশার দেখে বললেন- "আপনি প্রেশারের রোগী"। হয়তো আপনার আগে থেকেই প্রেশারের সমস্যা ছিল আপনি বুঝতে পারেননি। শতকরা ৯৫ শতাংশ লোকের ধারণা ঘাড়ে ব্যথা হলেই "উচ্চ রক্তচাপ"। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে ৯৫ ভাগ ঘাড়ে ব্যথার কারণ ঘাড়ের কারণেই হয়। এর সাথে প্রেশারকে মেলাতে যাবেন না।

প্রেশারের ঔষধ খাওয়ার তিন চারদিন পর প্রেশার মেপে দেখলেন তেমন কোনো উন্নতি নেই। একটি ঔষধ শরীরে খাপ খাওয়াতে পাঁচ থেকে সাত দিন সময় লেগে যায়। এটি নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, ঘন ঘন প্রেশার মাপলে প্রেশার বেড়ে যায় আবার আপনি যদি প্রেশার একেবারেই না মাপেন সেটিও খারাপ। অনেকগুলো বিষয় থাকে, যেমন- স্থুলতা, ডায়াবিটিস, রক্তে কোলেস্টেরল, দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, তেল-চর্বি, মশলাদার খাবার বেশি খাওয়া, ধূমপান, মদ্যপান, যকৃতের সমস্যা, কিডনির সমস্যা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারিবারিক উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস থাকলে, উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

উচ্চ রক্তচাপের ঔষধগুলো আবিষ্কারের সময় একটা জিনিস মাথায় রেখেই আবিষ্কার করা হয়েছে, রোগী ঔষধ খাবে সারাজীবন, যেন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হয়, তাই নির্ভয়ে ঔষধ খান। প্রেশারের ঔষধ খাওয়া শুরু করে ছেড়ে দিলে সেটি অনেক ভয়ংকর। এটি কখনো করবেন না। অনেকে প্রেশারের ঔষধ শুরু করতে চান না, ভাবেন- "ধুর! শুরু করলে সারা জীবন খেতে হবে, তার থেকে শুরু না করাই ভালো।" এটি পুরোপুরি ভুল ধারণা বরং এরকম ক্ষেত্রে ঔষধই আপনাকে ভালো রাখবে। যত দেরি করবেন আপনার কিডনি, চোখ, আপনার শরীরের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে সে আঘাত করবে না। যারা উচ্চ রক্তচাপের রোগী আছেন, প্রেশার মাপার ক্ষেত্রে এ কথাগুলো মনে রাখবেন। তাহলে দেখবেন আপনারা ভালো থাকবেন। আপনাদের ভালো থাকা আমার আজকের এই লেখার স্বার্থকতা।

*****

নারীর পরিচয় বৈষম্য

তিথি মজুমদার তৃণা
অফিসার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
ব্যাবিলন গ্রুপ

নামের শেষে পদবি বাঙালিদের প্রাচীন ঐতিহ্য। বাঙালি পুরুষগণ প্রাচীনকাল থেকেই নিজ বংশের পদবি ধারণ করেন। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সব পুরুষই নিজ বংশের পদবি ধারণ করেন। এর কারণ মূলত নিজের বংশ পরিচয় ধরে রাখতে পুরুষরা তাদের আদি পুরুষদের পদবি ব্যবহার করে আসছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই পদবি বৈষম্য না থাকলেও নারীদের পড়তে হয় অনেক বিড়ম্বনায়। কারণ বিয়ের আগে বাবার পদবি আর বিয়ের পর মেয়েদের বাবার পদবি বাদ দিয়ে স্বামীর পদবি ব্যবহার করতে হয়। শুধুমাত্র একটি নতুন সম্পর্কের জন্য শিক্ষাপ্রসূত এবং আইনগত সব অস্তিত্বকেই বদলে ফেলতে হয় আপাদমস্তক। কিন্তু কথা হলো পদবি পাল্টে ফেললে কি একটি মেয়ের পিতৃ-পরিচয় পাল্টে যাবে?

একটি নাম বা পদবি একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। শুধু হিন্দু না, সমাজের সব ধর্মেই এই প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। মানে বাবার বংশানুক্রমে পাওয়া এই পদবি বিয়ের পর পাল্টে যায়। নারীর বিয়ের আগে বাবার পদবি আবার বিয়ের পর স্বামীর পদবি নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে হয়। সমাজের এই নিয়ম কবে পাল্টাবে জানা নেই। নিজের বংশের পরিচয় বহন করা আমাদের সবার অধিকার ও কর্তব্য। আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের বংশপরিচয়েই বেঁচে থাকে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা উল্টো। একজন মেয়েরও অধিকার আছে তার নিজের পরিচয়ে বা পিতৃপরিচয়ে বাঁচার এবং নিজ বংশপরিচয়কে টিকিয়ে রাখার। এই একটি পদবি পাল্টানোর জন্য মেয়েদের বাবার বাড়ির সাথে তার জন্মগত সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। অথচ একটি ছেলের এ সকল ঝামেলায় কখনো পড়তেই হয় না। তাই মেয়েদের উচিত যেহেতু বাবার পদবি বিয়ের পর পাল্টে ফেলতে হয় তাই নিজের কোনো শক্ত পরিচয় তৈরি করা, যেটা হবে একটি মেয়ের নিজস্ব পরিচয়। যা নিয়ে অন্যরা গর্ব করবে আর সে পরিচয়ের জন্য কাউকে জবাবদিহি বা লিখিত কোনো চুক্তির মাধ্যমে পদবি পাল্টাতেও হবে না। এই পদবি পাল্টানোর জন্য মেয়েদের পড়তে হয় অনেক বিড়ম্বনায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

কখনো কখনো দেখা যায় এই পদবি পাল্টানোর জন্য মেয়েদের চাকরি ক্ষেত্রে অনেক বাধা আসে। কারণ একাডেমিক সকল সার্টিফিকেটেই জন্মগত পদবিই ব্যবহার হয়। কিন্তু পদবি পাল্টানোর জন্য এই ঝামেলাগুলো মেয়েদেরই ভোগ করতে হয়। আজকে এই সমাজে অনেক কিছুই পাল্টেছে কিন্তু কুসংস্কারমূলক রীতিগুলো এখনো অনেক শিক্ষিত সমাজেই বেশি দেখা যায়। আজকে এই যুগে এসেও বিশেষ করে মেয়েদের এই পদবি নিয়ে সমাজে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই সমাজে মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য মেয়েদের উচিত নিজের পরিচয় তৈরি করা। যাতে কোনো মেয়েকে নিজ পরিচয়ের জন্য সমাজে বিভিন্ন জায়গায় সমস্যায় পড়তে না হয়।

এখন অনেক মেয়েই আছে, যারা আজ শুধুমাত্র নিজের পরিচয়েই পরিচিত সমাজে। বিশ্বের প্রায় অনেক দেশেই মেয়েরা নিজ পরিচয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে কাজ করছে সমান তালে। এদিকে আমাদের বাঙালি নারীদের চিত্র পুরোই ভিন্ন। আমাদের দেশের মেয়েরা এখনো অনেক পিছিয়ে। এখনো চাকরি ক্ষেত্রে অনেক নারীদের হেয় করা হয়। মেয়েদের যোগ্যতা থাকলেও এখনো অনেক জায়গায় তাদের পিছিয়ে রাখা হয় নানা অজুহাতে। অথচ একজন যোগ্য নারীকে 'নারী বলে পারবে না' বলা ব্যক্তিরাই অযোগ্য ব্যক্তিদের ঠিকই একটি পদ-পরিচালনার দায়িত্ব দিচ্ছে অনায়াসে। তাই মেয়েদের উচিত নিজের একটি পরিচয় তৈরি করা যাতে তার যোগ্যস্থান থেকে কেউ তাকে সরাতে না পারে।

অর্থনৈতিক, শিল্পবাজারে ও প্রতিটি সেক্টরে আজ নারীরাও কাজ করছে সমান তালে। তার একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন প্রভাবতী গুপ্ত, প্রায় ৩৯০ খ্রিষ্টাব্দের সময়কালে। এই বৈষম্যের অন্ধকার ইতিহাসের আলোর বিন্দু হয়ে এসেছিলেন প্রভাবতী গুপ্ত। তিনি তখনকার গুপ্ত বংশের দ্বিতীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের কন্যা ছিলেন। প্রভাবতীর বিয়ে হয় বাকটক সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে। তিন পুত্র হওয়ার কিছুদিন পরে রাজা রুদ্রসেন মারা যান। এরপর সকলেই ভাবে প্রথা অনুযায়ী রাজার প্রথম পুত্রই রাজার আসনে বসবে অথবা রুদ্রসেনের ভাইয়েরা কেউ সিংহাসনের দায়িত্ব নিবেন। কিন্তু ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিয়ে ছেলেকে সামনে রেখে সিংহাসনে বসেন প্রভাবতী নিজেই, এবং নতুন শাষণে সকল সিলমোহর, সকল মুদ্রায় তার প্রভাবতী নামের পাশে তার বাবার পদবি 'গুপ্ত' ব্যবহার করেন। এমনকি তার গোত্রও পরিবর্তন করেননি তিনি। পুত্র সাবালক হলে রাজ্যাভিষেকের পরও প্রভাবতী সংযুক্ত শাষক হিসেবে থেকে যান। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, জমি বিলি বন্দবস্তকরণ, ইত্যাদি সকল কিছুতে তার নাম, সই, সিলমোহরের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর এভাবেই প্রভাবতী গুপ্ত নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তাই নিজের গুরুত্ব নিজেকেই বুঝতে হবে। নিজের পরিচয় ধরে রাখতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হলে সবারই নিজস্ব পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সাহস করে নিজেকেই এগিয়ে আসতে হবে।

'বংশ, গোত্র, পদবি পাল্টালে এমন কিইবা আসে যায়' এমন যুক্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকে অনেক প্রবঞ্চনা। সমাজে অনেক কিছু সংস্কার হয় কিন্তু নারী বৈষম্যের, অধিকারের কি সংস্কার হয়েছে? প্রতিটি সেক্টরে আজও নারীদের ছোটো করে দেখা হয়। বর্তমান সমাজে পুরোনো প্রথা ভেঙে নতুন করে নারীদের ঘুরে দাঁড়ানো উচিত। পৃথিবীতে নারীর সংকট বহুমুখী। প্রতিটি জায়গাতেই বিভিন্ন ভাবে নারীরা নির্যাতনের শিকার। তাই নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে অনেক সময় চুপ থেকেই সহ্য করতে হয় অনেক নির্যাতন।

একটি জিনিস এখনো লক্ষণীয় নয় পুরুষ শাসিত সমাজে যে, একজন নারী যখন বৈবাহিক জীবনে পদার্পণ করেন তখন তার বাবা, মা, ভাই, বোন সবকিছু ছেড়ে সম্পূর্ণ একটি নতুন পরিবেশে আসে সারা জীবনের জন্য। এরপরই তার গোত্র-পরিচয়ও পাল্টে ফেলা হয় তৎক্ষনাৎ। কিন্তু আমরা এটাই ভুলে যাই দিনশেষে সব ছেলে মেয়েই কিন্তু তার মায়ের নাড়ি ছেঁড়া ধন। তাই ছেলে হোক বা মেয়ে, নিজের জন্ম পরিচয় ধরে থাকা সবারই মৌলিক অধিকার। এখানে কারোরই হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

এই লেখনিতে নারীর পরিচয়ের বৈষম্য প্রসঙ্গ এই জন্যই তুলে ধরা হলো কারণ আমাদের এই পোশাক খাতে প্রচুর নারী শ্রমিক রয়েছে যাদের মধ্যে বেশিরভাগ নারীই এই বৈষম্যের শিকার। অনেকে জানেই না যে নিজের পরিচয়ে বাঁচা প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, এবং নিজের পরিচয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলেই মানুষ আপনার ব্যক্তিসত্ত্বাকে চিনবে। এই কঠিন দুনিয়ায় নিজের অধিকার নিজেকেই আদায় করে নিতে হয়। আপনি কে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন, সব কিছু আপনার নিজের পরিচয়ের মাঝেই লুকিয়ে থাকে। নিজের এমন একটি অবস্থান তৈরি করুন যেন আপনার ব্যক্তিগত সত্ত্বা কেউ চাইলেই নষ্ট করতে না পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা অন্যায়, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখুন। দিন শেষে আপনার নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাই আপনাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস জোগাবে। পরিশেষে একটি কথাই সত্য এই পৃথিবীতে-

"আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

*****

‘স্মৃতিসৌধ থেকে মাজার’– এক সন্ধ্যার ডায়েরি

আরিফ হোসেন
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

গ্রীষ্মের তাপদাহে পুড়ছে জনপদ, বিপর্যস্ত জনজীবন। জলবায়ু পরিবর্তনের কুফলে প্রতিদিন বেড়েই চলেছে গ্রীষ্মের তাপদাহের তীব্রতা। এরকম পরিস্থিতিও আমার প্রতি শুক্রবারের রুটিনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। ঘড়ির কাঁটায় বিকাল পাঁচটা। আমার বাসার সামনে থেকে মাত্র মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর দশ নম্বর কমিউনিটি সেন্টার সংলগ্ন গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমি এখন মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে। এই স্মৃতিসৌধটি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। দক্ষিণ পাশে প্রখ্যাত/গুণীজনদের জন্য সংরক্ষিত কবরস্থান। উত্তরের বড় অংশ সাধারণদের জন্য কবরস্থান। আর এই উত্তর–দক্ষিণের মাঝখানে রয়েছে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ। এই জায়গাটি বেশ খোলামেলা হওয়ায় আমার খুব ভালো লাগে এখানে সময় কাটাতে। আমার গন্তব্য আপাতত দক্ষিণ অংশের দুই বীরশ্রেষ্ঠ– শহিদ ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমান ও শহিদ সিপাহী হামিদুর রহমান এবং এদেশের গার্মেন্টস শিল্পের অগ্রদূত ও দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব এম. নুরুল কাদের এর কবর। এখানে এলে প্রথমে এই তিনটি কবরের সামনে চুপচাপ কয়েক মিনিট দাঁড়ানো আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কখনো কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে সূরা/কারাত পড়ি তাঁদের আত্মার শান্তির জন্য, আবার কখনো এমনিই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। সেদিন দেখলাম এই কবরস্থান এলাকার বিভিন্ন স্থানে মাটিতে ছোটো লাঠি/বাঁশ খুঁড়ে তাতে মাটির পাত্রে পানি রাখা। পাত্রের ঠিক

নিচেই সাইনবোর্ড– "পাখির জন্য পানি, সৃষ্টির প্রতি সদয় হোন।" গ্রীষ্মের তীব্র তাপদাহে এ ধরনের সুন্দর উদ্যোগ দেখে ভীষণ ভালো লেগেছে। বন্ধু মাসুদকে কল দিতে হবে, বিষয়টি তাকে জানানো দরকার। কিন্তু অদ্ভুত এক কারণে সে হয়তো ফোন রিসিভ করবে না! সে জানে– সাধারণত এ সময়ে আমি কবরস্থানে সময় কাটাই। কবরস্থান শব্দটিতে তার অনেক ভয়! অথচ আমি সময় পেলেই এখানে ঘুরতে আসি। যদিও জানি– একদিন স্থায়ীভাবে থাকার জন্যও কোনো না কোনো কবরস্থানেই যেতে হবে। আসলে মানুষের নিজের বলতে কেবল মৃত্যুটুকুই আছে, বাকি সবই তো অন্যের জন্য! এই স্মৃতিসৌধ এলাকার আর একটি স্থানও আমার ভীষণ প্রিয়। বন্ধু মাসুদ বেশ অবাক হয়, কবরস্থান কারো কাছে কীভাবে প্রিয় হতে পারে! তবে আমার কাছে ভালোই লাগে। এই স্মৃতিসৌধের উত্তরে সাধারণের জন্য যে নির্দিষ্ট কবরস্থান রয়েছে, সেখানে একটু ভিতরের দিকে একটি বকুল ফুলের গাছ আছে। গাছটার নিচে বকুল ফুল পড়ে থাকে, আমি সেগুলো থেকে কিছু কুড়িয়ে নিই। বকুলের সুঘ্রাণে জাদু আছে। আমি হাতের মুঠোয় বকুল ফুলগুলো রাখি, একটু পরপর ফুলগুলো থেকে ঘ্রাণ নিতে আমার খুব ভালো লাগে।

কবরস্থানে সময় কাটানো আপাতত শেষ। আমার পরবর্তী গন্তব্য– মিরপুর দিয়াবাড়ি বেড়িবাঁধের রাস্তা। আরো নির্দিষ্ট করে বললে দিয়াবাড়ি ঘাট। এই ঘাট থেকে ডিঙি নৌকা তুরাগের এপার–ওপার যাতায়াত করে। সরু নদীর ওপারে কাউন্দিয়া এলাকা। সেখানের লোকজনকে এপারের দিয়াবাড়ি ঘাট থেকে খালি চোখেই দেখা যায়। তবে এখানের ইঞ্জিনচালিত নৌকা যায় সাদুল্লাপুরের উদ্দেশে। সাদুল্লাপুর– যা অনেকে "গোলাপ গ্রাম" নামেও চেনে। ঘাটটিতে পৌঁছে আমি তো বেশ অবাক আর একইসাথে মুগ্ধ! কেউ যদি এই ঘাট সংলগ্ন রাস্তাটি পূর্বে দেখে থাকে, তবে এর পরিবর্তিত রূপ দেখে তিনি অবাক না হয়ে পারবেন না। তুরাগ নদীর পাড়ে রঙিন ফুটপাত সাপের মতো এঁকেবেঁকে সামনের দিকে চলে গেছে। তুরাগ নদীর কিনারা সিমেন্টের ব্লক দিয়ে বাঁধানো। জায়গাটাকে এখন কী সুন্দর লাগছে! যত্ন নিলে রত্ন মিলে– এ কথাটা এই স্থানের সাথে মানানসই! এক সময়ের নোংরা নদীর পাড় এখন সবার বিনোদনের আর হাঁটাচলা করার প্রিয় স্থানে পরিণত হয়েছে। এ রকম পরিবর্তনের পেছনের কলাকুশলীদের জানাই আমার অন্তরাত্মার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। তবে নদীর পানির দূষণ কিন্তু আগের মতোই আছে! নদীর জন্যই এ জায়গাটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর লাগে। নদীর এ করুণ দশা থাকলে এক সময় হয়তো ফুটপাত থাকবে কিন্তু নদীটা আর থাকবে না। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাবছেন বলে বিশ্বাস করি। এ মুহূর্তে প্রচুর মানুষের ভিড় এখানে। অথচ আগে এখানে এত মানুষজন

আসতো না। বেড়েছে হকারদেরও ব্যস্ততা। একপাশে তো নাগরদোলাও বসানো হয়েছে, ছোট শিশুরা কাঠের তৈরি নাগরদোলায় চড়ে আনন্দ করছে। পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে দেখি সূর্য মামা ডুবি ডুবি করছে। আকাশে এ মুহূর্তে অদ্ভুত লাল রঙের মেলা। আমার হাতের মুঠোয় থাকা বকুল থেকে একটা মিষ্টি সুবাস ভেসে আসছে। মোবাইল ক্যামেরার মাধ্যমে এই মায়াময় মুহূর্তটার একটি স্থিরচিত্র নিতে ভুল করলাম না। কোনো এক অলস সময়ে হয়তোবা এই ছবি দেখে নস্টালজিয়ায় হারিয়ে যাবো...

এবার গন্তব্য– সুলতানুল আউলিয়া বাগদাদী হযরত শাহ্ আলী (রঃ) মিরপুর মাজার শরিফ। বেড়িবাঁধ থেকে খুব বেশি দূরে না। বিশ মিনিট পায়ে হাঁটার পথ। উইকিপিডিয়ার সৌজন্যে জানা যায়– সুফি ব্যক্তিত্ব শাহ্ আলী বাগদাদীর জন্ম বাগদাদের ফোরাত নদীর তীরবর্তী একটি কসবাতে। তিনি আরবাঞ্চল হতে ধর্ম প্রচারার্থে ১৪৮৯ সালে তৎকালীন পাক-ভারত উপমহাদেশে একশত জন সঙ্গী নিয়ে আগমন করেন। তিনি প্রথমে ফরিদপুরের 'গেদ্দায়' নামক স্থানে আসেন। এরপর ঢাকার আশে-পাশে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। মিরপুরাঞ্চলে যখন তিনি উপস্থিত হন তখন সেখানে জরাজীর্ণ প্রায় ধ্বংসন্মুখ একটি মসজিদ দেখতে পান। কথিত রয়েছে মসজিদটির বাইরে তার অনুসারীগণ অবস্থান করলেও তিনি মসজিদের দরজা বন্ধ করে ভিতরে একা ৪০ দিনের মেয়াদে চিল্লায় বসেন। ভিতরে যতকিছুই হোক না কেন, তিনি তার মুরিদগণকে চিল্লার ৪০ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই ভিতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিলেন। চিল্লার শেষ পর্যায়ে ৩৯তম দিনে ভিতর হতে ভয়ংকর আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। যাতে মনে হচ্ছিলো ভিতরে দুইটা সত্ত্বার মধ্যে তুমুল লড়াই হচ্ছে। এক পক্ষ আর্তচিৎকার করছে। ফলে অসহায় হয়ে তার অনুসারীগণ দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করলে সাথে সাথে ভয়ংকর আওয়াজও বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে তারা তার রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন দেহ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। তখন একটি দৈববাণী শোনা যায়, "যেখানে পড়ে আছে সেখানেই দাফন কর।" অতঃপর তাকে উক্ত মসজিদের ভিতরেই দাফন করা হয়। তখন হতে মসজিদটি তার দরগা শরিফে পরিণত হয়।

আমি এখন মাজার শরিফের উত্তর পাশের গেট সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে। এ মুহূর্তে এক কাপ রং চা ভীষণ দরকার। আমি যে চায়ের দোকানে বসলাম তার ঠিক সামনেই মাইজভান্ডারি আস্তানা শরিফ ও বাউল শিল্পীদের বিভিন্ন অফিস চোখে পড়ে। এখানের চায়ের দোকানগুলোতে কাওয়ালি সংগীত শোনা যায়। মাজার জিয়ারতকারী লোকজন পরম ভক্তি নিয়ে এ জাতীয় গান শুনেন। এসব দেখার জন্য আমি এই চায়ের

দোকানেও প্রতিদিন পাঁচ/দশ মিনিটের জন্য বসি। একদিন চায়ের দোকানে বসে লক্ষ করছিলাম– মাইজভান্ডারি আস্তানা শরিফের সামনে ভক্ত লোকজনের অতি ব্যস্ততা। জানতে পারলাম, মাইজভান্ডারি আস্তানা শরিফ থেকে কথিত "বাবা" নাকি এখন নামবেন। মাইজভান্ডারি আস্তানা শরিফ ও শাহ্ আলী মাজারের মাঝখানে যে সরু রাস্তা, তা চলে গেছে মিরপুর-১ এর সড়কের দিকে। ভক্তরা দেখলাম আস্তানা শরিফের সাইডের রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিলেন। এর ফলে সরু রাস্তায় কিছুটা যানজটের মতো অবস্থা তৈরি হলো। একটু পর সংবাদ এলো বাবা নামাজে বসেছেন, নামতে একটু দেরি হবে। কিন্তু ভক্তরা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করলেন না। ভক্তদের অতি উৎসাহ দেখে আমারও কথিত "বাবা" কে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। আনুমানিক ১০-১৫ মিনিট পর কথিত "বাবা" নিচে নামলেন। প্রায় ষাটোর্ধ্ব পায়জামা-পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত একজন ব্যক্তিকে আস্তানা শরিফের ভেতর থেকে আসতে দেখলাম। আস্তানা শরিফের গেটের ঠিক সামনেই একটি প্রাইভেট কার দাঁড়ানো। একজন ভক্ত গাড়ির একটি গেট খুলে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখা মাত্রই ভক্তরা আগের দিনের রাজা-বাদশাহদের কুর্নিশ করার মতো করলেন অনেকে, কেউ কেউ তার পায়ে, হাতে, পাঞ্জাবিতে ছুঁয়ে চুমু খেলেন। অনেকে আবার গাড়ি ছুঁয়ে চুমু খেয়েও অতি ভক্তি দেখালেন। তিনি চলে গেলে সবাই যে যার মতো আবার আড্ডা/গল্পে মেতে উঠলেন।

আমি এবার মাজার শরিফের ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমি যে দিক দিয়ে প্রবেশ করেছি সে গেট সংলগ্ন একটি মসজিদ আছে। যেখানে মাজারের ভিতর থেকেও ঢোকা যায় আবার মাইজভান্ডারি আস্তানা শরিফের রাস্তা সংলগ্ন গেট দিয়েও মসজিদে প্রবেশ করা যায়। মাজারের এলাকাটা কিন্তু বিশাল। একপাশে পুরুষ জিয়ারতী শেড অন্য পাশে মহিলাদের জন্যও রয়েছে আলাদা শেড। মহিলাদের নামাজের ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে। মাজারের ভিতরে একটি পুলিশ কন্ট্রোল রুম ও একটি প্রশাসনিক ভবন আছে। প্রশাসনিক ভবনের বাম পাশে একটি বড় পুকুরও আছে। এর দক্ষিণ পাশে বিশাল খোলা জায়গা আছে। ওখানে মাজারের সিন্নি/ খিচুড়ি রান্না হয় এবং বাৎসরিক উরসের সময় এখানে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ভক্ত/ আশেকানরা তাবু গাড়ে/ প্যান্ডেল তৈরি করে। উরসের সময় পুরো মাজার রঙিন বাতি দিয়ে সাজানো হয়। উরস উদযাপনের সময় হামদ থেকে শুরু করে নাত পর্যন্ত পড়া হয় এবং কাওয়ালির মতো ধর্মীয় সংগীত গাওয়া হয়। নানা রকমের খাওয়া-দাওয়া চলতে থাকে সমানতালে। সাধারণত দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত উরস চলে। সে সময় প্রচুর মানুষের ভিড় হয় এখানে। মাজারের যে বিষয়টি আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করে, প্রকৃতপক্ষে আমি যে কারণে এখানে প্রায় প্রতি শুক্রবারেই আসি, তা হলো– এখানের নানা রকমের পাখির কিচির-মিচির শব্দ।

মাজারের ভিতরে ছোট-বড় মিলে আনুমানিক ১৫–২০টি গাছ আছে। এর মধ্যে বেশ বড় ও প্রাচীন দুটি বটগাছে কয়েক হাজারের মতো পাখি বসবাস করে। বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এদের কিচির-মিচির শব্দ আমার ভীষণ ভালো লাগে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিখ্যাত উপন্যাস– লালসালু পড়েছিলাম। সেই থেকে মাজার সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছি তার অনেক কিছুর আলামতও খুঁজে পেয়েছি এখানে। বর্তমানে মাজারকে কেন্দ্র করে নানারকম রিপুতাড়িত কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়। যেমন–

১) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা/ নোংরামি, গান-বাদ্য এবং মদ ও গাঁজা হচ্ছে মাজারকেন্দ্রিক উরস ও মেলার অন্যতম অনুষঙ্গ।
২) এছাড়াও আছে মাজারকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধান্দা। মাজারে আগত নারী-পুরুষের দান-দক্ষিণা ও মান্নত-কোরবানি গ্রহণ করে, তাবিজ-কবজ ও আশীর্বাণীর ক্রয়-বিক্রয়।
৩) কুফর ও শিরকে লিপ্ত।

মাজারের এসব উরসে অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগ হলো সমাজের অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠী। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য, নিম্ন জীবন-যাপনের মান– বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে যুগে যুগে মাজার সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে– কুফর ও শিরকে লিপ্ত হওয়া। আমি নিজের চোখে দেখেছি– মাজারপন্থি বা মাজারে আগত লোকজন বিভিন্ন কুফরি ও শিরকি ধারণা পোষণ করে। যেমন– মাজার বা মাজারে শায়িত ব্যাক্তিকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করা; বালা-মুসিবত-বিপদ থেকে উদ্ধারকারী এবং মানুষের উপকার/ অপকারের মালিক মনে করা, ইত্যাদি। এসব শিরকি বিশ্বাস থেকে তারা বিভিন্ন শিরকি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। যেমন– মাজারের নামে মান্নত করা, মাজারে এসে সিজদা করা, মাজারের বটগাছের গোড়ায় দুধ ঢালা, আগরবাতি/ মোমবাতি জ্বালানো, পশু জবাই করা, মাজারওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে ধন-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি, সুস্থতা প্রার্থনা করা, ইত্যাদি। মানুষ এখানে এসে ভুলে যায়– মানুষের জীবন-মৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, উন্নতি-অবনতি, সবকিছুই একমাত্র সৃষ্টিকর্তার হাতে। তাঁর ইচ্ছায় সব হয়। সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার। দুঃখের বিষয় হচ্ছে এদের বুঝানোর সাধ্য নেই কারো, বুঝাতে গেলে তারা আপনাকে বোকা ও পাগল বানিয়ে ছাড়বে!

এবার নীড়ে ফেরার পালা। মাজার থেকে বের হয়ে সাবধানে বাড়ি ফিরতে হবে। সারাদেশে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সরকার ঘোষিত কারফিউ চলছে। ছুটির দিন হওয়ায় কারফিউ পরিস্থিতির মধ্যেই বাসা থেকে বের হয়েছি। অন্তত ছুটির দিনটাতে বাসায় বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না। এমনিতেই বাংলাদেশ পুলিশের ব্যাপক ক্ষমতা, এর মধ্যে চলছে কারফিউ। পুলিশ চাইলেই এ পরিস্থিতিতে যে কাউকে

জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আর যদি তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে আমার মতো সাধারণ জনগণের জন্য সর্বনাশ! সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা সংস্কারের দাবীতে সারাদেশে ছাত্র সমাজের আন্দোলন চলছে। আন্দোলন দমনে সরকারও রয়েছে কঠোর অবস্থানে। পরিস্থিতি তাই মোটেই সুবিধার না। বেশকিছু ছাত্র ও সাধারণ মানুষও আন্দোলনে নিহত হয়েছেন পুলিশের গুলিতে। আন্দোলনকারীদের কাছে শহিদের মর্যাদা পেয়ে যান রংপুরের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সে ভিডিও ছড়িয়ে পরে সবার কাছে। নিরস্ত্র ও নির্ভীক আবু সাঈদ সেদিন তার দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে দৃঢ়প্রত্যয়ে পুলিশের সামনে বুক পেতে দাঁড়ান। পুলিশ নির্মমভাবে তাঁর উপর গুলি ছুঁড়েন, গুলিবিদ্ধ হয়েও আবু সাঈদ তার অবস্থান থেকে সরে যাননি, আবারও দুই হাত দুদিকে প্রসারিত করে বুক পেতে দেন পুলিশের সামনে। একের পর এক গুলিতে একসময় আবু সাঈদ রাস্তায় বসে পড়েন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আবু সাঈদের সেই হত্যার ছবি এবং ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মূলত আন্দোলন দাবানলের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। দলে দলে ছাত্র-জনতা পাড়ায়-মহল্লায় নেমে পড়ে। তারা বিচার চেয়ে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মিছিল করে। নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের প্রোফাইল লাল রঙে ছেঁয়ে যায়। ঢাকার উত্তরায় আন্দোলনকারীদের মাঝে পানি বিতরণ করার সময় গুলিতে প্রাণ হারান আরেক শিক্ষার্থী, মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। তাঁর সেই ডাক– 'পানি লাগবে কারো, পানি, পানি?' এখনো যেন কানে ভাসে। এদের মৃত্যুর সংবাদ শুনে একটা আশ্চর্য রকমের কষ্টের অনুভূতি হয়েছিলো আমার। মনে হয়েছিলো যেন আপনজন হারিয়েছি আমি!

মাজারের প্রধান গেট দিয়ে যখন বের হবো, ঠিক তখনই দেখলাম মেইন রাস্তায় লোকজন বিভিন্ন দিকে দৌড়ে পালাচ্ছে। ঠিক পিছনেই পুলিশের একটি গাড়ি লক্ষ করলাম। পুলিশ লাঠিচার্জ করছে আর লোকজন যে যেদিকে পারছে দৌড়ে পালাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে মাজার থেকে বের হওয়ার সাহস হলো না আমার। কিছুক্ষণ পর পুলিশের গাড়ি চলে গেলে আমি মাজার থেকে বের হলাম। এ সময় মাজারের মসজিদের মাইকে মাগরিবের আযানের সুমধুর শব্দ শুনতে পেলাম– "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।" আযানের শব্দটা মনে একটা শক্তি, শান্তি এনে দিলো। কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো থমথমে একটা পরিস্থিতি থেকে যেন স্বস্তি ও মুক্তি খুঁজে পেলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমার বাসার পাশের 'জান্নাতুল বাকি জামে মসজিদ' এর সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমার স্মৃতির ক্যানভাসে রচিত হলো আরো একটি মুহূর্ত– "স্মৃতিসৌধ থেকে মাজার- এক সন্ধ্যার ডায়েরি।"

*****

শীত স্মৃতি

ইথার আখতারুজ্জামান
প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

হাওয়া ইশারা দিচ্ছে আলমারি থেকে পুরোনো সোয়েটার নামাতে হবে।
শীত আসছে।

শীত আসে আসুক,
তার সাথে আমার কোনো লেনদেন নেই।
সমস্যা হলো শীত আসলে পরে অলস হতে ইচ্ছে করে।
ঘড়ির কাঁটা থামিয়ে সব স্থবির করে দিতে ইচ্ছে হয়।

শীত আসলেই আমার স্কুলে অ্যাসেম্বলি ক্লাসের কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে তোমার চোখে আড়চোখে তাকিয়ে সমবেত কণ্ঠের শপথ, জাতীয় সংগীত..।
আরো মনে পড়ে তোমার ডার্ক নেভি-ব্লু কার্ডিগানের কথা,
সাদা ফিতায় বাঁধা বেণির কথা।

শীতের স্মৃতি মানেই জ্বর, ঠান্ডা, কাশি।
শীতের স্মৃতি মানেই বার্ষিক বনভোজনে তোমার আরো একটু পাশাপাশি।
শীত মানেই আমি বছর ঘুরে দেখি শূন্যতার কাছাকাছি।

*****

বিরহের কালো মেঘ

সৈয়দ মাহাবুব মোর্শেদ
সিনিয়র অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

কত শত পথ পেরিয়ে, লোকালয় ছেড়ে
অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমিয়েছি, তাও বহু আগে,
চিরচেনা পথগুলো ইদানীং বড্ড অচেনা লাগে,
মনের গভীরে লুকানো কষ্টগুলো একান্ত নিজেরই থাক।

এই আমিটা কেন জানি, আর আমি নেই
আজকাল নিজেকে নিজের কাছে তুচ্ছ মনে হয়,
গাছ তলার ওই প্রশান্তির শীতল ছায়াটা মনের ভাবনায় আজও দৃশ্যমান,
ভাবছি আবারও শীতল পরশে নিজেকে রাঙাবো।

কল্পিত স্বপ্নে, আজও ছায়া হয়ে মনের গভীরে ঘুরে বেড়ায় ডানাকাটা পরিটা,
বিরহ ব্যথায় স্মৃতিকাতর হৃদয়ে, শুধু ভাবছি অতীতের দুঃসহ স্মৃতিগুলো,
বিষাদের সুর হয়ে কালো মেঘগুলো তখনো মাথার উপরে অন্ধকার রূপে ভেসে বেড়ায়,
আত্ম-অহংকারী ভাবনায় অভিমানী মনটা ব্যাকুল হৃদয়ে আজও ডুকরে কাঁদে।

বিচ্ছেদের সুর হয়ে পরিটা ইদানীং আশেপাশে ঘুরঘুর করে,
তখনো স্বপ্নগুলো আলো-আঁধারি খেলায় মত্ত,
শান্ত হৃদয় তখনো আশান্বিত, যদিও . . .
পরিস্থিতির কঠিন বাস্তবতায় মনের গভীরে লুকানো ইচ্ছেগুলো অধরাই রয়ে গেল।

*****

আমার মা

মোসা. মোবাশ্বেরা আক্তার
জুনিয়র কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

ফুলের মতো দেখতে লাগে
আমার মায়ের মুখ,
তার আঁচলে লুকিয়ে আছে
আমার সকল সুখ।

আমার মুখের প্রথম বুলি
মায়ের কাছে শেখা,
আমি জিতলে মায়ের মুখে
দেখি হাসির রেখা।

চাঁদ, তারা-কে সাক্ষী রেখে
বলতে আমি চাই,
মায়ের চেয়ে আপন কেউ
এই ভুবনে নাই।

আমার সুখে হয় সে সুখি
দুঃখে হয় উদাসী,
তাইতো আমি আমার মা কে,
অনেক ভালোবাসি।

*****

আমাদের অরণ্যের দিনরাত্রি

আরিফ ভূঁইয়া
গ্রুপ সিইও
ব্যাবিলন গ্রুপ

১৯৯৪ সালের ৭ ও ৮ই ডিসেম্বর হরতাল। ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর সাপ্তাহিক ছুটি। ঠিক হলো মধুপুর জঙ্গলে বেড়াতে যাবো। এমবিএ পাশ করে তখন হাসিব ময়মনসিংহে বেশ সময় কাটাচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক মালিকানাধীন ছায়াবাণী সিনেমা হলের ব্যাবসায়িক সফলতা আনা। সেটা নিয়ে অবশ্য বন্ধুদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতুকের সৃষ্টি হয় প্রায়ই। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তো হাসিবকে পাঠানো হলো মধুপুরের জঙ্গলে একটা থাকার ব্যবস্থা করতে, যদি ফরেস্টের কোনো বাংলো পাওয়া যায়। প্ল্যান হলো আমরা পাঁচজন ঢাকা থেকে ৬ই ডিসেম্বর অর্ধেক অফিস করে ময়মনসিংহ পৌঁছাবো এবং সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ থেকে মধুপুর। যেহেতু ৭ই ডিসেম্বর থেকে হরতাল, রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে পৌঁছানোর বিকল্প ছিলো না। খবর এলো, যে বাংলোর ব্যবস্থা হয়েছে সেটার উপরে টিনের চাল ছাড়া চারিদিকে ফাঁকা। আমাদেরকে লেপ, তোশক, বিছানাপত্র, ইত্যাদি নিয়ে যেতে হবে। এই খবরে আমাদের মধ্যে এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার জেগে উঠলো। আমার মনের মধ্যে অনেক রকম সম্ভাব্য সিচুয়েশন আসতে থাকলো এবং কোনোটাই আমাকে নিরুৎসাহিত করলো না। সত্যি বলতে সবাই অজানার মুখোমুখি হওয়ার জন্য কিছুটা উত্তেজিতও বটে। ৬ তারিখ বিকেল ৪টার দিকে মালিবাগ মোড় থেকে সাগর, অলক, সাল্লু, ইশতি ও আমি বাসে উঠলাম। তখনকার দিনে ময়মনসিংহ যেতে ২/৩ ঘণ্টার মতো সময় লাগতো। সন্ধ্যার মধ্যে সবাই হাজির হলাম ময়মনসিংহের ছায়াবাণী সিনেমা হলে। সিনেমা হলের উপরের দিকে একটা প্রাইভেট ব্যালকনিতে হাসিবকে পাওয়া গেলো। কবরী অভিনীত কোনো সিনেমা চলছিলো। সবমিলিয়ে ৬-৮ জন দর্শক পুরো সিনেমা হলে। হাসিবের সিনেমা ব্যাবসা টার্নঅ্যারাউন্ড এর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে "কবরী সপ্তাহ"

চলছিলো। আমাদের বন্ধু এই কাজে বেশিদিন থাকলে এই সিনেমা হলের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটা বুঝা গেলো এবং এই বিষয়ে একটা তাৎক্ষণিক আড্ডাও হয়ে গেলো। আড্ডার পর দলেবলে আমরা পৌঁছালাম হাসিবের বাসায়, ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের উল্টোদিকে।

দেরি করার সময় নেই, সেই রাতেই মধুপুর পৌঁছাতে হবে। পরেরদিন থেকে হরতাল। একটা টেম্পো জোগাড় হলো। সেটার ছাদে তোশক, লেপ বাঁধা হলো। অলোক কিছু দড়ি কিনে আনলো, যদি কোনো বাঘ ভাল্লুক ধরা পড়ে, বাঁধার কাজে লাগবে। সাথে কয়েকশ মোমবাতি আর কিছু বিস্কুট। আমাদের থাকার জায়গার যে বর্ণনা ছিলো তাতে জঙ্গলের মধ্যে একটা ছাদ ছাড়া আর কিছু নেই। এরকম একটা জায়গায় শুধু লেপ তোশক নিয়ে তিন দিন কীভাবে কাটাবো সেই চিন্তা কারো মধ্যেই ছিলো না। খাওয়া দাওয়ার সম্ভাব্য কী ব্যবস্থা সেটাও কারো জানা ছিলো না। "আল্লাহ ভরসা"-র উপর যুবক বয়সেই বেশি ভরসা থাকে হয়তো। ময়মনসিংহের বিখ্যাত মকুলের চায়ের দোকানের চা এবং সিঙ্গারা খেয়ে আমরা রওয়ানা দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের টেম্পো শহরের আলো ছেড়ে অন্ধকার পথে চলতে শুরু করলো। কয়জন যুবক চুপচাপ বসে থাকবে তাতো হয় না। আবার একটু চ্যালেঞ্জিং কিছু করবে না, তাও হয় না। আমরা আলো-আঁধারির মধ্যেই 'গিভ আস এ ক্লু' খেলতে শুরু করলাম। ছয়জনের দলে ছয়টা ক্যারেক্টার। যতো না খেলা হলো তারচেয়ে বেশি হলো হাসাহাসি। একসময় বাসরাস্তার উপর একটা বন্ধ দোকানের সামনে টেম্পো থামলো। রাত দশটার মতো বাজে। সেখান থেকে জঙ্গলের ভিতরের পথ ধরতে হবে। টেম্পো এর বেশি যাবে না। কোত্থেকে দুইটা রিকশাভ্যান এসে হাজির। রাতের জঙ্গলের সুনসান স্তব্ধতা আর তারা ভর্তি আকাশের আলোর আভায় ভ্যান চললো। প্রায় দশ মাইলের পথ। শীতের রাত। শালবনের ভিতর দিয়ে উঁচুনিচু মাটির রাস্তায় রিকশা চলছে। গা ছমছম করা পরিবেশ। তার উপর ঠান্ডা। লেপ তোশকের উপর বিভিন্ন ভঙ্গিতে সবাই বসে আছি। ঘোরের মধ্যেই রাস্তাটুকু পাড় হয়ে গেলাম। স্তব্ধ চারিদিকে। অন্ধকারের মধ্যে কিছুদূরে একটা ঘরের অবয়ব দেখা যাচ্ছে। আশেপাশে কোনো জনমানবের অস্তিত্ব নেই। ঘরটাতে একটাই বড়ো রুম। সামনে একটা বারান্দা। মোমবাতি জ্বালানো হলো। এটা একটা পরিত্যক্ত ইয়ুথ হোস্টেল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বানিয়েছিলো কোনো এক সময়। জানালার কিছু পাল্লা নেই। ফ্লোর থেকে জায়গায় জায়গায় ইট বের হয়ে আছে। দুইটা দরজা অক্ষত, তবে কোনো ছিটকিনি নেই। ঘরটার শেষ মাথায় দুটো দরজা। এই দরজা দুটো আমাদের পুরো সময়টায় মাত্র একবার খোলা হয়েছিলো, মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ করার পর কেউ আর ওইদিকটায় যাওয়ার সাহস করেনি। ওইরাতে জঙ্গলকেই প্রাকৃতিক কাজের জন্য উপযুক্ত জায়গা হিসেবে বেছে নেয়া হলো। রিকশাভ্যান চালকের মাধ্যমে

জানা গেলো পাশেই একটা বাসায় এক বৃদ্ধা বাঙালি মহিলা আর তার ছেলে থাকে। গভীর রাতে ছেলেটা এলো। তার কাছ থেকে আশপাশের একটা বর্ণনা পাওয়া গেলো। ঠিক হলো, সে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবে। সেই রাতে গরম পানি ছাড়া কিছু পাওয়া গেলো না। গরম পানিতে ডুবিয়ে শুকনো বিস্কুট দিয়ে রাতের খাওয়া হলো। অলকের আনা দড়িগুলো ঝাড়ু হিসেবে বেশ কাজে দিলো। লম্বালম্বি এক সারিতে আমরা ছয়জন লেপের নিচে। কারো চোখেই ঘুম নেই। ওই অন্ধকারের মধ্যে বাইরে থেকে বিভিন্ন রকম আওয়াজের বিভিন্ন অনুভূতি শরীর আর মনে। শেষ আওয়াজটা আসছিলো সাল্লুর দিক থেকে। তার বিখ্যাত নাক ডাকার আওয়াজ। একসময় সব আওয়াজ, হাসাহাসির সমাপ্তি ঘটে আমাদের ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যদিয়ে।

শীতের সকালে বাইরে এসে জায়গাটাকে আমরা আবিষ্কার করতে থাকলাম। সামনে বেশ খানিকটা জায়গা ঢালু এবং ফাঁকা। কিছুদূর পর থেকে খানিকটা ধানক্ষেত। ডানদিকে কিছুটা ফাঁকা জায়গার পর শালগাছের জঙ্গল। ঘরটার বাঁয়ে একটা টিউবওয়েল এবং অবাক হলাম যে টিউবওয়েলটা কাজ করে। ঘরটার পিছনে আরো একটা ঘর আছে যেটা রান্নার কাজে ব্যবহার হতো একসময়। পাশের বাড়ির ছেলেটার নাম এখন আর মনে নাই। সেই আমাদের পুরো সময়টার বাজার এবং খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব নিলো। মাইলখানেক দূরে জঙ্গলের ভিতরে পায়ে হাঁটা পথের সংযোগস্থলে একটা মুদি দোকান আর একটা অস্থায়ী চেহারার বাঁশের তৈরি চায়ের দোকান। সেখানেই তৈরি হলো আমাদের সকালের নাস্তা। প্রথমদিন আবিষ্কার করলাম যে দোকানের কারিগর ভালো রসগোল্লা বানাতে পারে, যদি অগ্রিম অর্ডার পায়। নাশতা শেষে রসগোল্লার অর্ডার দিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাংলোর পথে হাঁটা ধরলাম। পথে একটা খবরের কাগজের পাতা কুড়িয়ে পেয়ে ইশতি কেটে পড়লো শালবনের আড়ালে। আমাদের লেপ তোশকগুলো বাইরে রোদে দেওয়া হলো সেগুলোকে কিছুটা মচমচে করবার জন্য। কেয়ারটেকার খিচুড়ি রান্নায় ব্যস্ত। আমরা কয়জন ক্রিকেট খেললাম বিপুল আনন্দে। খেলা শেষে সবাই একসাথে গোসল করতে গেলাম টিউবওয়েলের ঠান্ডা পানিতে। একটা বালতি, একটা মগ, ছয়জন যুবক একসাথে গোসল করবো। পানির পাত্র দখল নিয়ে মারামারি আর পানি ছিটাছিটির সময় 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র কুয়ার পাশে গোসলের কথা মনে আসছিলো। মনে কী একটা আশা জাগছিলো যে শর্মিলা ঠাকুরের মতো রূপবতী কেউ হাজির হবে কিনা!

যাইহোক, অমৃত স্বাদের খিচুড়ি খেয়ে আমরা সবাই উঠানে বিছানো রোদে দেয়া গরম গরম তোশকের উপর শুয়ে গল্প করতে করতে একটা দিবানিদ্রাও দিলাম। বাচ্চাদের হাসিতে ঘুম ভাঙলে দেখি অলক আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর পিছনে পিছনে ৫-৭ জন দশ-

এগারো বছরের ছেলে। অলক একটা চশমা পড়ে আছে যেটার একটা গ্লাস নেই, দুই পায়ে দুইটা পলিথিনের ব্যাগ মোজা পরার ঢঙে পড়ে আছে। গলায় ফিতা আটকানো একটা কাচের রিফ্লেক্টর, যেটা সে দূর দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা প্লেনের দিকে তাক করার চেষ্টা করছে।

সূর্য ততক্ষণে একদিকে হেলে পড়েছে। কেয়ারটেকার আমাদের জন্য রিকশাভ্যান জোগাড় করে আনলো। আমরা বেশ ফিটফাট হয়ে বেরোলাম জঙ্গলের ভেতর গারো বসতিতে ঘুরে বেড়াবার জন্য। শালবনের ভিতর মাটির রাস্তা ধরে ভ্যান চলছে। মাঝে মধ্যে কিছু মাটির ঘর চোখে পড়ছে। আকারে ছোটো ছোটো ঘরগুলো, ঘরের সামনে দুই চারটা ফুলের গাছসহ একটা বাগান। শুনেছিলাম গারোদের গ্রামে 'রাইস ওয়াইন' পাওয়া যায়। সেই সন্ধ্যায় মনের মধ্যে 'রাইস ওয়াইন' পাওয়ার ইচ্ছাও উঁকি দিচ্ছিলো। এক মধ্যবয়সী গারো পুরুষ, বাড়ির সামনে আগুন জ্বেলে বসে ছিলো। আমরা গিয়ে বসলাম তার পাশে। বেশ অনেকক্ষণ গল্প হলো তার সাথে। এইটা তার শ্বশুরবাড়ি, এখন এটাই তার নিজের বাড়ি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। চাষবাসের অনেকটাই স্ত্রীলোকেরা করে। পুরুষগুলোকে বেশ অলসই মনে হলো। গল্প শেষে আগুনের আরাম এবং রাইস ওয়াইন পাওয়ার আশা ছেড়ে ফিরে এলাম আমাদের ভাঙা বাংলোয়। বারান্দায় একটা সিলভারের হাঁড়ি রাখা। ঢাকনা সরিয়ে দেখা গেলো ভেতরে জ্বলজ্বল করছে রসগোল্লা। মনে হলো আদিম যুগে ফিরে গিয়েছি! বারান্দায় রসগোল্লা! মনে পড়লো সকালের দেয়া রসগোল্লার অর্ডার। দড়ি দিয়ে আটকানো দরজা খুলে দেখি ভিতরে আমাদের জিনিসপত্র একদম ঠিকঠাক। সুনসান নীরব চারিদিক। বেশ শীত পড়েছে। ক্যাম্পফায়ারের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছি আমরা। সাল্লু ব্যস্ত ছবি তোলায় এবং ছবি তোলার বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করায়। অলক হঠাৎ দেখি আফ্রিকান ট্রাইবদের মতো চিৎকার করে আগুনের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে এদিক ওদিক করছে। অল্পকিছুক্ষণ পর আমরা সবাই আগুনের চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছি আর ইচ্ছেমতো ভৌতিক আওয়াজ করছি। একসময় আগুনের শিখা কমে এলো। আমরা ভিতরে এসে ঠান্ডা লেপের ভিতর ঢুকে অপেক্ষায় আছি শরীরের গরমে কখন লেপের ভিতরটা গরম হয়।

পরদিন খবর পেলাম, কাছেই এক সাহেব পাদরি, একটা স্কুল পরিচালনা করেন। সেখানে সেইদিন গ্রামের গারো যুবক-যুবতিদের নিয়ে বড়োদিন উপলক্ষ্যে একটা আনন্দ অনুষ্ঠান আছে। আমাদের ভ্যান নিয়ে সন্ধ্যার দিকে আমরা হাজির হলাম সেই স্কুলে। স্কুলের গেইটে ছেলে মেয়েদের জটলা। তাদের থেকে আসন্ন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ধারণা পেলাম। আর এটাও জানলাম যে দূরে যে সাহেব পাদরি দুটো জার্মান শেপার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার অনুমতি প্রয়োজন। সাক্ষাৎ চাইলাম সাহেব পাদরির। আমাদের

পরিচয় এবং এই জঙ্গলে উপস্থিতির ব্যাখ্যা দিলাম। সেই সাথে আমাদের পাদরিদের কলেজে (নটরডেম কলেজে) পড়ার ইতিহাস জানাতেও ভুল করলাম না। আমরা যে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত সেটাই অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আশেপাশের গারো ছেলে মেয়েদেরও কিছু সাপোর্ট পেলাম। মনে হলো সাহেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের হল ঘরে দর্শক হিসেবে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তবে বললেন আমাদের হলের একদম পিছনের সারিতে বসতে হবে। কয়েক সারি বেঞ্চ। বেশ বড়ো ক্লাস রুম। সামনে বেশ কিছুটা জায়গা ছেড়ে মঞ্চ বানানো হয়েছে। জাতীয় সংগীত এবং বাংলায় অনুবাদ করা বড়োদিনের গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একে একে শিল্পীরা দলীয় গান, কবিতা, কৌতুক দিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। দর্শকদের যতোটা না আনন্দ দিচ্ছিলো, তার চেয়ে বেশি আনন্দ শিল্পীরা নিজেরাই পাচ্ছিলো। কৌতুক অভিনেত্রী তো তার হাসির দমকে পুরো কৌতুকটাই শেষ করতে পারেনি। সামনের খোলা জায়গায় ছেলে মেয়েরা গান, নাটিকা, কৌতুকাভিনয় করছে। মনে হচ্ছিলো হলের কয়জন বিশেষ যুবকের উপস্থিতি তাদের পারফর্মেন্সকে বিশেষভাবে ইনফ্লুয়েন্স করছিলো। আমরা পুরো অনুষ্ঠান থেকে যতোটুকু না আনন্দ পাচ্ছিলাম, তারচেয়ে বেশি উত্তেজনা হচ্ছিলো পুরো আয়োজনের অংশ হতে পারায়। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে কয়েকজন ছেলে রুমে ঢুকলো কিছু বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গারোদের একটা কম্পোজিশন বাজাতে বাজাতে। শুরু হলো গোল হয়ে গারো ছেলে মেয়েদের নৃত্য। আমাদের মধ্যে একমাত্র সাগরের ব্যক্তিত্ব ছিল জড়তামুক্ত। আমাদের জড়তাও বাধা হলো না যখন গারো মেয়েরা আমাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো নৃত্যরত বৃত্তের মধ্যে। বেশ কিছু গারো যুবতি। অনুভব করলাম আমাদের ভেতরের উত্তেজনা। মনের মধ্যে জটিল হিসাব। গারো মেয়েদের সান্নিধ্য আর বাইরে জার্মান শেপার্ড নিয়ে অপেক্ষারত পাদরির উপস্থিতির সচেতনতা। সাহেবের বিবেচনায় অনুষ্ঠান আর দীর্ঘায়িত হওয়া সমীচীন ছিলো না। ভিতরে খবর পাঠানো হলো। আমরা বিদায় নিয়ে বাংলোয় ফিরে এলাম, আমাদের জন্য অপেক্ষারত মিষ্টির হাঁড়ি আর ক্যাম্পফায়ারের কাছে। আগুনের পাশে বসে গভীর রাত পর্যন্ত চললো আড্ডা।

পরদিন ফিরে আসবার সময়ে আমাদের সবার মন বেশ খারাপ। এই আনন্দের জায়গাটা ফেলে চলে যেতে হবে। মধুপুর বেড়ানোর কিছুদিন আগেই আমরা সুনীলের "অরণ্যের দিনরাত্রি" সিনেমাটা দেখি। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অরণ্যের দিনরাত্রি" সিনেমার চরিত্রগুলো মনে উঁকি দিচ্ছিলো। মনের অনুভূতিতে তখন আমরা একেকজন সেই গল্পের একেকটা চরিত্রের মতোন। জঙ্গলে অবস্থানের পুরোটা সময়ই আমাদের মনে হতো আমরা যেন সেই কাহিনির একেকটা চরিত্র।

*****

মামার মুখে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ

লুবাইয়া ইয়াসমিন
ওয়েলফেয়ার অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

বহু বছর হয়ে গেছে, তবুও মনে পড়লে যেন শরীরটা শিউরে উঠে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তখন আমার বয়স ২০ কি ২২ হবে, রাতে ঘুমিয়ে আছি আমার বুবুর সাথে। আমরা দুইভাই এবং তিন বোন ছিলাম। পড়াশুনার জন্য নিজের বাবা-মাকে ছেড়ে বড়ো বুবুর কাছে থাকতাম। বুবু আমাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন। যাই হোক, রাত যখন গভীর হচ্ছে চারিদিকে প্রচণ্ড শব্দ-(কান্না/হৈচৈ) হঠাৎ-ই আমার ঘুম ভেঙে গেলো। দেখি আমাদের বাড়িতে সবাই যার যা আছে (টাকা, গহনা, প্রয়োজনীয় খাবার) নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারলাম দেশে কিছু একটা ঘটেছে। আমি আমার বুবুকে একটা প্রশ্ন করতেই সে আমাকে বলে উঠলো, "ভাই আমি তোরে হারাইতে চাই না! কথা না কইয়া আয় আমার লগে।"
তারপর আমরা সবাই আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে পায়ে হেঁটে নদীর পারে গিয়ে গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। এরপর থেকে আমরা সেখানে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে দিনের বেলা থাকতে শুরু করলাম। কথিত সময়ে, যে সময় একটা মেয়ে বাইরে বের হতে বা পুরুষের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সাহস রাখতো না, অথচ আমার বুবু এদিক থেকে অনেক বেশি সাহসী এবং বলিষ্ঠ স্বভাবের ছিলেন।

চারিদিকে যখন গোলাগুলি-মারামারি-আতঙ্ক বিরাজ করছে, সারাদেশে যখন যুদ্ধ লেগেছে, শুরু হয়েছে নিরীহ মানুষদের মেরে ফেলা, মা-বোনদের সম্মান হননের খেলা, তখন আমার বুবু আমাকে ডেকে বললেন, "ভাই, তুই বইসা থাকিস না, এইবার দেশের জন্য কিছু কর। তোর কিছু হইলে হইবো, কিন্তু দেশের সব মানুষরে বাঁচা।" আমি আমার বুবুর জন্য এবং দেশের জন্য যুদ্ধে যাবো ভেবে মনস্থির করলাম। আমার বুবু আমাকে দোয়া দিয়ে হাতে একটি লাঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। ভাবা যায়, কতোই বা বয়স আমার! সেই বয়সে লাঠি, তাও আবার যুদ্ধে। আমার বুবু আমাদের এলাকায় যে সকল মুক্তিবাহিনী ছিলো, তাদের খাবার রান্না করে খাওয়াতো। আমি দেখেছি-আমার এক চাচাতো ভাই সদ্য বিয়ে করেছিলো, কিন্তু সেও যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলো। কতশত নারী তার সম্ভ্রম দিয়েছে, কত পরিবার ঘর ছাড়া হয়েছে!

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরে যেন এই স্মৃতিগুলো আরো বেশি নাড়া দেয় আমাকে। যখনই একাকিত্ব বোধ করি, তখনই সেই অতীতের স্মৃতিগুলো ভাবি, তখন সহসাই যেন শরীরে আলাদা একটি শক্তি পাই। মনোবল বেড়ে যায় বহুগুণ।

এখন বয়স বেড়েছে, ছেলেমেয়ে সবাই উচ্চ শিক্ষিত, দেশের বাইরে থাকে। অনেকবার আমাকে এবং আমার অর্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু ওই যে আমার শক্তি, আমার অনুপ্রেরণা, আমার দেশাত্ববোধ, আমাকে আগলে রেখেছে পরম যত্নে। ঠিক যেমন একটি শিশু তার মায়ের কোলে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত এবং স্বস্তি অনুভব করে, নিজের দেশের মাটিতে আমিও তেমনই অনুভব করি।

- এই লেখাটি আমার মামার কাছে শোনা তাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলির ঘটনা অবলম্বনে লেখা, আমার মামা ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, মো. শামসুল হক, এবং আমার খালামণি, মোছা. কমলা বেগম।

*****

ফ্রেন্ডস লাইব্রেরি

শেখ মৃণ্ময় জামান
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

এক.

একজন বিখ্যাত ফরাসি কবি ও ঔপন্যাসিক, আনাতোল ফ্রঁস বলেছিলেন- "কখনোই কাউকে বই ধার দিবেন না, কেউই বই ফেরত দেয় না। আমার লাইব্রেরিতে শুধু সেসব বই-ই আছে যেগুলো লোকেরা আমাকে ধার দিয়েছিলো।" কিন্তু আমি যে লাইব্রেরিটার কথা বলছি সেখানে ধার করা কোনো বই ছিলো না। বইগুলো বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করেছিলেন আমার আব্বা, পরবর্তীতে আমার বড়ো ভাই এবং সবশেষে আমি।

লাইব্রেরির নাম 'ফ্রেন্ডস লাইব্রেরি'। সম্ভবত নব্বই দশকের মাঝামাঝির দিকে ব্যাংক টাউন (সাভার)-এ অবস্থিত আমাদের বাসায় সংগ্রহে থাকা বই দিয়ে আমার বড়ো ভাই তন্ময় ও রুবেল নামের তার এক বন্ধু মিলে গড়ে তোলে 'ফ্রেন্ডস লাইব্রেরি'। সেই সময়ে অন্যান্য গল্পের বইয়ের পাশাপাশি রকিব হাসানের তিন গোয়েন্দার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। আশেপাশের পরিচিত কিশোরেরা মহা উৎসাহে ফ্রেন্ডস লাইব্রেরি থেকে বই সংগ্রহ করতো। যতোটুকু মনে পড়ে লাইব্রেরির সদস্য হতে হলে ২০ টাকা এবং প্রতিমাসে ১০ টাকা চাঁদা দিতে হতো। একটা রেজিস্টারে কে কোন বই নিয়েছে তা এন্ট্রি দেয়া হতো এবং এক সপ্তাহের ভিতরে বই ফেরত দেয়ার জন্য বলা

হতো। পূর্বের বই ফেরত দিয়ে তবেই নতুন কোনো বই সংগ্রহ করা যেতো। এভাবে ভালোই চলতে লাগলো। পরবর্তীতে বড়ো ভাইয়ের এস.এস.সি. পরীক্ষা ঘনিয়ে আসলে লাইব্রেরিতে আর সেরকম সময় দিতে পারছিলো না। এমন সময় আমি আমার এক বাল্যবন্ধু হাসিবকে নিয়ে লাইব্রেরি চলমান রাখার দায়িত্ব নিলাম। সেই

সময় কার্টুনিস্ট প্রাণের কমিকস চাচা চৌধুরী, বিল্লু, পিঙ্কী, রমন, ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। আমার মনে আছে সেই সময় খাবার সময়েও পাশে কমিকস এর বই থাকতো। আমি আর হাসিব একই স্কুলে পড়ার কারণে দীর্ঘদিন লাইব্রেরির কার্যক্রম চালিয়ে নিয়েছিলাম। মনে পড়ে ২০০০ সালের দিকে এলাকার সকল কিশোরদের মাঝে আমাদের ফ্রেন্ডস লাইব্রেরির পক্ষ থেকে একটা কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম। সাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক প্রায় ২৫/৩০ টা প্রশ্ন ছিলো। অসংখ্য প্রতিযোগীর ভেতর থেকে প্রথম তিন জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছিলো।

আমার প্রিয় শিক্ষক খালেক স্যার আমাদের এই লাইব্রেরির কার্যক্রমের কথা শুনে খুবই খুশি হয়েছিলেন। তিনি আমাদের বই পড়ার বিষয়ে বেশ উৎসাহ দিতেন। স্কুল ছাড়ার পর দীর্ঘদিন স্যারের সাথে দেখা হয়নি। আশাকরি হয়তো একদিন দেখা হয়ে যাবে প্রিয় এই মানুষটির সাথে। ২০০০ সালে স্কুল পরিবর্তন করার কারণে লাইব্রেরির কার্যক্রম ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং আমাদের দুই বন্ধুর পক্ষে এক সময় আর লাইব্রেরির কার্যক্রম ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে শৈশবের এক মধুময় স্মৃতি হয়ে আছে এই 'ফ্রেন্ডস লাইব্রেরি'।

দুই.

শৈশবে বই পড়ার যে অভ্যাস গড়ে উঠেছিলো পরবর্তীতে অন্য সকলের মতোই মোবাইল ফোনের অধিক ব্যবহার এবং তারও পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তির প্রভাবে বইয়ের সাথে ধীরে ধীরে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। সেই সাথে বুক সেলফে অলস সময় পার করা গল্পের বইগুলোর অভিমান দিন দিন বাড়তে থাকে।

কাকতালীয় হলেও সত্যি যে ব্যাবিলনে যুক্ত হওয়ার পর 'ব্যাবিলন কথকতা' নামক পত্রিকাটি বইয়ের প্রতি আগ্রহ ফিরিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সহকর্মীদের অসাধারণ লেখনি এবং কথকতার সাজসজ্জা, বই পড়ার পাশাপাশি কিছু একটা লেখার বিষয়েও উৎসাহের সৃষ্টি করে। ব্যাংক টাউনের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকায়, কর্পোরেট এইচ. আর. -এর আরিফ ভাইয়ের ধারণা ছিলো আমি চাইলেই লিখতে পারবো। সত্যি কথা বলতে আসলেই আমার লেখালিখির তেমন কোনো অভ্যাস ছিলো না। ছোটোবেলায় অল্প কিছু ছড়া লিখেছিলাম যা নিতান্তই হাতে গোনা। তাই আরিফ ভাই আমার কাছে বারবার লেখা চেয়েও ব্যর্থ হন। কিন্তু আরিফ ভাই হাল ছাড়ার পাত্র নন, আমি লেখা না দিলেও উনি প্রতি বছরই আমার

কাছে লেখা চান এবং ট্রাই করতে বলেন। সে ধারাবাহিকতায় ১৭ তম সংখ্যার জন্য আরিফ ভাই যখন লেখা চাইলেন তখন আমি বেশ বিব্রতবোধ করলাম। অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনোভাবেই লেখা আসে না। হঠাৎ মনে পড়লো প্রায় দুই দশক আগে ঢাকা কমার্স কলেজের বাৎসরিক সাময়িকী 'প্রগতি'-তে ২০০৩ সালের সংখ্যায় আমার একটি ছড়া প্রকাশিত হয়েছিলো যেটি ছিলো আমার প্রকাশিত প্রথম এবং শেষ কোনো লেখা। বিস্তারিত কিছু না বলে আরিফ ভাইকে সেই ছড়াটিই আবার কথকতার জন্য জমা দিলাম। শৈশবের লেখা হওয়ায় সেটা ছাপা হবে কিনা সে ব্যাপারে চিন্তা করিনি। কিন্তু কথকতার ১৭তম প্রকাশনা উৎসবের আগে যখন লেখা ছাপা হওয়ার পত্র পেলাম তখনকার অনুভূতি যেন আমাকে শৈশবের আনন্দের অনুভূতিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। এটি ছিলো আমার লেখা ছাপা হওয়ার দ্বিতীয় ঘটনা। ঘটনাচক্রে ১৭তম সংখ্যা থেকেই লেখা ছাপা হলে বিশেষ সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয়, সে হিসেবে আমিও তা পেয়ে গেলাম।

আসলে কোথাও নিজের নাম ছাপা হওয়ার মাঝে যে এক অদ্ভুত আনন্দ বিদ্যমান তা কথকতার লেখকরা বোধ করি ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারেন। সেই অনুপ্রেরণা থেকে ১৮তম সংখ্যার জন্যও একটি ছোটো গল্প জমা দেই। সৌভাগ্যক্রমে কথকতায় ২য় বারের মতো আমার লেখা ছাপা হয়েছিলো। ইদানিং ১৯তম সংখ্যায় লেখা জমা দেওয়ার জন্য কর্পোরেট এইচ.আর. -এর সুবন বেশ চাপ দিচ্ছে।

তিন.

শৈশবে ফ্রেন্ডস লাইব্রেরি নিয়ে যিনি বেশ উৎসাহ প্রদান করেছিলেন সেই প্রিয় খালেক স্যারের সাথে হঠাৎ একদিন স্মৃতিময় সেই স্কুলের সামনেই দেখা হয়ে গেলো। সেই আগের মতোই আছেন। চোখেমুখে রাজ্যের অনিশ্চয়তা নিয়ে এখনও গড়ে চলেছেন অসংখ্য ছাত্রের নিশ্চিত জীবন।

*****

অধরা স্বপ্ন

মো. মহসীন
প্রাক্তন গ্রুপ জিএম, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স/ট্রেজারি
ব্যাবিলন গ্রুপ

সকালে প্রতিদিন ঘুমটা ভেঙে যায়, হকারের উচ্চ-চিৎকার আর চ্যাঁচামেচিতে। কখনও শুনতে পাই, এই তরকারি লাগবে, তরকারি? এই মাছ, তাজা মাছ। প্রতিদিনের এই যন্ত্রণা সহ্য হলেও শুক্রবারে সকালবেলায় এসব চিৎকার-চ্যাঁচামেচি বড্ড বিরক্ত লাগে। সারাটা সপ্তাহের প্রচণ্ড খাটনির পর একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হয়।

মেসের জীবনটা বড়ো কষ্টের, যারা কখনও মেসে থেকেছে তারাই শুধু জানে। এই যেমন আমরা মাঝারি একটি রুমে চার বন্ধু দুটি চৌকিতে গাদাগাদি করে থাকি, এটা কষ্টকর হলেও মানিয়ে নিয়েছি।

সকাল ৭টার দিকে আমাদের মেসের কাজের বুয়া, রেনুর মা এসে কলিংবেল বাজালে আরো একবার ঘুম ভেঙে যায়। সে একটু খিটখিটে স্বভাবের হলেও, মনটা খুব ভালো।

একবার মেসে রেনুর মা সকালবেলা আমার রুমে ঝাড়ু দিতে এসে দেখে আমি প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপছি আর আবোলতাবোল বকছি। আমার সিটমেট জামিল তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রেনুর মা জামিলকে ঘুম থেকে তুলে, জ্বর না কমা পর্যন্ত বালতি দিয়ে আমার মাথায় অনেক সময় ধরে পানি ঢেলেছিলো। সেদিন রেনুর মা এর মাতৃসুলভ যত্নের কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

আমার যখন প্রচণ্ড জ্বর হয় কিংবা মন খারাপ থাকে, তখন মায়ের কথা বেশি মনে পড়ে। মা যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে হয়তো আমাকে এই কষ্টের দিন দেখতে হতো না। আমার বয়স যখন দশ বছর, তখন এক সকালে স্ট্রোক করে আমার মা মারা যান। আমরা ছিলাম তিন ভাই ও এক বোন। ছোটো ভাই আয়ানের বয়স তখন মাত্র এক বছর ছিলো, তার বড়ো বিল্লুর তিন বছর আর একমাত্র বড়ো বোন আয়েশার ছিলো মাত্র বারো বছর।

মায়ের মৃত্যুর পর আমাদের নতুন ঠিকানা হয়েছিল নানা বাড়ি। দিনরাত ধরে আমার ছোটো ভাই "আয়ান" প্রচণ্ড কান্না করতো মায়ের জন্য। এতটুকু দুধের শিশু সামলাতে, সে যে কী যন্ত্রণাময় ঘুমহীন দিন পার করেছি, মনে হলে এখনও শরীরে কাঁটা দিয়ে

উঠে। কবরস্থানের পাশে একটি বড়ো আম গাছ ছিল, আমি গোপনে ওই গাছটিতে চড়ে মায়ের কবরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর একা একা অভিমান করে তার সাথে কথা বলতাম, আর কাঁদতাম। মা ছাড়া সন্তানরা যে কত অসহায়, সেটা আমরা প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করেছি।

বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর আমাদের নতুন কষ্ট শুরু হলো। বাবা আমার ছোটো দুই ভাই আয়ান এবং বিল্লুকে তাদের সাথে ঢাকা নিয়ে গেল। তাদের জন্য আমার ভীষণ পরান পুড়তো। আমি সারারাত কাঁদতাম, কাউকে বুঝতে দিতাম না। এরমধ্যে নানি আয়েশা (আমার বোন) আর আমাকে বাড়ির কাছের জুনিয়র স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পড়ালেখায় আমার একটুও মন বসতো না।

বাবার সাথে আমাদের বছরে দুবার দেখা হতো, সেটা ঈদের সময় । সে যে কী অপেক্ষা ছিলো বাবা এবং ছোটো দুই ভাইয়ের জন্য। তখন তো আজকের মতো মোবাইল ছিলো না। বাবাকে চিঠি লিখতাম আর চোখের পানিতে সেই চিঠির কাগজ ভিজে যেতো।

সেবার কুরবানির ঈদে বাবা ঢাকা থেকে সবাইকে নিয়ে নানাবাড়িতে বেড়াতে এলো। বিল্লু আর আয়ানকে দেখে আমার মনটা ভালো হয়ে গেলো। আমি তাদেরকে পুরো গ্রাম ঘুরাই, পুকুরে গোসল করাই, মাঠে খেলতে নিয়ে যাই। একদিন বিল্লু আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাইয়া সবার মা তার বাচ্চাদের আদর করে, কিন্তু আমাদের মা শুধু মারে কেন?

আমি একথাটা বাবা, নানি, মামা সবার সাথে শেয়ার করলাম, ছোটো বলে কেউ আমার কথাটাকে গুরুত্ব দেয়নি। বাবা বললেন, পড়াশুনা আর দুষ্টামির জন্য একটু বকাঝকা হয়তো করেছে, এগুলো কিছু না। আমার মনের কষ্ট মনেতেই চাপা রয়ে গেলো।

ছুটি শেষে বাবা সবাইকে নিয়ে আবার ঢাকাতে চলে গেলো। তাদের মায়া আমি ভুলতে পারছিলাম না। আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। দিন দিন আমার শরীর ভেঙে যেতে লাগলো। আমাকে গরুর গাড়িতে করে জেলা সদরে ফয়েজ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সারাটা রাস্তা প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে আবোলতাবোল বকছিলাম, আর মাকে ডাকছিলাম।

ফয়েজ ডাক্তার চেক করে বলল, রোগীর অবস্থা বেশি ভালো না, তাড়াতাড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। বাবাকে জরুরি টেলিগ্রাম করা হলো। টেলিগ্রাম হাতে পেয়ে পরদিনই সবাইকে নিয়ে বাবা হাসপাতালে হাজির। আমার ভাইদের দেখেই আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। কিন্ত শরীরে এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই

যে, উঠে তাদেরকে একটু কোলে নিয়ে আদর করবো।

বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বললো, কিরে ছোটু জ্বর বাঁধালি কী করে? বাবা আমাকে আদর করে ছোটু বলে ডাকতো। তারপর বলল চিন্তার কিছু নেই, একদম ঘাবড়াবি না, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা পুরো ছয়দিন আমার সাথে হাসপাতালে ছিলো। আমার প্রতি বাবার যে টান, আর ভালোবাসা দেখেছি, কয়েকদিনের জন্য মা হারানোর কষ্টের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সাতদিন পরে হাসপাতাল থেকে আমাকে রিলিজ দেয়া হলো। আমার ছোট দুই ভাইকে পেয়ে আমি যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে প্রাণ ফিরে পেলাম।

ওদের সাথে ফড়িং ধরা, পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা, সাইকেল চালানো, এভাবে আমার দিনগুলো ভালোই কাটছিলো। এরমধ্যে বাবার ছুটি শেষ হয়ে যাওয়াতে, ঢাকায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছিলো। আমার ছোটো ভাই দুটোর সে যে কী কান্না! আমাদের ছেড়ে তারাও ঢাকা ফিরে যেতে চাচ্ছে না। তাদের জন্য কষ্টে আমার ছোটো বুকটা ভেঙে যেত, শুধু ডুকরে ডুকরে কাঁদতাম। বাবা আমার কান্না দেখে সিদ্ধান্ত নিলো, আমাদের দুজনকেও ঢাকা নিয়ে যাবে। নানি বললো, ওরতো এখনও শরীর ঠিক হয়নি, ভীষণ দুর্বল। বাবা অভয় দিয়ে বললো, ঢাকাতে নিয়ে ছোটুকে ভালো ডাক্তার দেখাবো, ও এখন থেকে আমাদের সাথেই থাকবে। কিন্তু নানি, মামারা মেয়েমানুষ বলে আমার বোন আয়েশাকে বাবার সাথে দিতে রাজি হলো না, আমার সৎমার উপর ভরসা করতে না পেরে।

সেদিন আমার যে কী আনন্দ! এক সকালে সবার সাথে ঢাকায় পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে আমার নতুন কষ্টের শুরু। আমার নতুন মা, ঢাকার বাসায় আমার আসাটা একদমই মেনে নিতে পারেনি।

বাবা সব বুঝতেন। শুধু বলতেন, দ্যাখ ছোটু, তুই সংসারের বড়ো ছেলে, ঠিকভাবে লেখাপড়া করে মানুষ হয়ে যা।

বাবা ঢাকায় আমাকে সরকারি কোয়ার্টারের আগের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলো। পুরোনো বন্ধুদের সাথে আবার দেখা। এভাবে দিন চলে যেতে লাগলো। কিন্তু রাত হলেই নানি, মামা আর বোনটির কথা শুধু মনে পড়তো। কাঁথা মুড়ি দিয়ে আমি কাঁদতাম আর লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি পাঠাতাম।

সকালে বেশিরভাগ সময় না খেয়ে স্কুলে যেতাম। বাবা গোপনে আমাদেরকে কিছু টাকাপয়সা দিতেন, সেটা দিয়ে স্কুলের টিফিন বিরতির সময় প্রানবল্লভের মিষ্টির দোকান থেকে দুটো সিংগারা কিনে খেতাম, সেটাই ছিলো আমার দুপুরের খাবার। স্কুল থেকে ফিরে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে খেলতে

যেতাম। তারপর বাসায় ফিরে পড়তে বসতাম আর বাবার জন্য অপেক্ষা করতাম। বাবা বাসায় ফিরে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একসাথে খেতে বসতো। বাবা সামনে থাকতো বলে, নতুন মা কিছু বলতে সাহস পেতো না, তখন আমরা পেট ভরে খেতাম। বাবা সারাদিন পর যখন বাসায় ফিরতো, তার দিকে চেয়ে আমার ভীষণ মায়া হতো। আমি বুঝতাম, আব্বার পক্ষে এই ছোট্ট কেরানির চাকরি দিয়ে এতবড়ো সংসারের খরচ যোগাড় করা ভীষণ কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিলো।

তাই আমি ক্লাস এইটে উঠেই, দুটো বাচ্চাকে পড়াবার টিউশনি জোগাড় করে ফেললাম। আমি অতোটুকু বয়সে বুঝে গিয়েছিলাম, আমাকে কষ্ট করে হলেও মানুষ হতে হবে। তারপর ভালো একটা চাকরি পেলে নানিবাড়ি থেকে আমার বোনকে আমার কাছে নিয়ে আসবো।

এরমধ্যে ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েটে ভালো রেজাল্ট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাউন্টিং অনার্সে চান্স পেয়ে গেলাম। কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারেই বুঝে গেলাম, প্রাইভেট না পড়লে অ্যাকাউন্টিং-এ পাশ করাটা কষ্টকর হয়ে যাবে। ক্লাসমেটরা তখন অ্যাকাউন্টিং এর নামকরা টিচার শরীফ স্যারের কাছে পড়তো। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমার ক্লাসেরই এক বন্ধু ইউসুফ সব শুনে বললো, দ্যাখ, আবাসিক হলে সিট পাওয়াটা বেশ ঝামেলার কাজ, তাছাড়া মারামারি-কাটাকাটি লেগেই থাকে। তাই আমরা কয়েক বন্ধু মিলে কলাবাগানে একটা মেসে থাকি, শরীফ স্যারের বাসাও ওখান থেকে কাছে। এই মাসে একটা সিট খালি হবে, তুইও আমাদের সাথে থাকতে পারিস। তারপর একটা টিউশনি যোগাড় করে দিবো, সেটা দিয়ে তুই নিজের খরচ মোটামুটি চালাতে পারবি।

তারপর একদিন কলাবাগানের মেসে উঠলাম। এভাবেই শুরু হলো আমার মেসের জীবন। এতসব ভাবতে ভাবতে, ক্লান্তিতে কখন যে আমার চোখটা একটু লেগে এসেছিলো টের পাইনি।

রেনুর মায়ের ডাকে অনেকটা বিরক্তিতে চোখটা মেললাম। ভাইজান উঠেন, আপনার কাছে একজন গেস্ট আসছে। এত কইরা ভেতরে আসতে বললাম কিন্তু আসলো না। দরজার বাইরে খাড়াইয়া আছে।

ওয়াশরুমে গিয়ে মুখে একটু পানির ঝাপটা দিলাম, তারপর দরজার বাইরে এসে আমি তো অবাক!

- কেমন আছেন সাকিব ভাই?

- ভালো, কিন্তু তুমি এখানে!

- আপনি ঝটপট রেডি হয়ে নেন, আপনার সাথে কিছু জরুরি কথা আছে।

- ভেতরে এসে বসো।

- না না ঠিক আছে, আমি বাইরে গাড়িতে বসছি।

আমার মনের ভেতর প্রশ্নের জাল বিস্তৃত হতে শুরু করলো, ভাবছি আজ এতো বছর পর অহনা এখানে! আমার মেসের ঠিকানাই বা পেলো কী করে?

মনে শত প্রশ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ আর কৌতূহল নিয়ে রেডি হয়ে বাইরে এসে দেখি অহনা গাড়িতে বসে আছে।

আমাকে দেখে দরজাটা খুলে দিয়ে বললো, আসেন ভেতরে আসেন। আমি সংকোচ নিয়ে পিছনে অহনার সাথে বসলাম। ওর শরীরে দেয়া দামি পারফিউমের সুবাস আমার নাকে আসলো। বেশ মিষ্টি একটা গন্ধ। ভাবলাম, নিশ্চয় খুব দামি হবে।

ও বললো, কতদিন পর দেখা তাই না! জানেন সাকিব ভাই, কত কষ্ট করেছি আপনার এই বাসার ঠিকানা খুঁজে বের করতে।

আমি স্বাভাবিক হবার জন্য বললাম, - কী যেন কথা আছে বললে?

- বলবো, আগে চলেন শান্ত, নিরিবিলি কোথাও গিয়ে একটু বসি।

বললাম, আমাদের গলির রাস্তার অপোজিটেই ধানমণ্ডি লেক, চলো ওখানটায় যাই। আমার আবার টিউশনি আছেতো, তাড়াতাড়ি ফেরা যাবে।

তারপর দুজনে ধানমন্ডি লেকের পাড়ে, কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে কাঠের একটা বেঞ্চিতে বসলাম।

আজকে তেমন একটা রোদ নেই, আকাশে বেশ মেঘ জমে আছে, খুব মিষ্টি একটা হাওয়া বইছিলো তখন। অহনা বললো, বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে! আজ বৃষ্টি হলে, আমি ভিজবো।

এই আবহাওয়াতেও আমি ভীষণ ঘামছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, অহনা কী নিয়ে কথা বলবে। ও কি আমাকে ভালোবাসে! না না তা কী করে সম্ভব? ওর বাবা ওয়াপদা অফিসের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলো। সরকারি কলোনিতে ওরা থাকতো অফিসার্স কোয়ার্টারে আর আমরা থাকতাম তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত ভবনে। ওদের স্ট্যাটাসের সাথে আমাদের ছিলো বিশাল তফাৎ।

আমি এতসব যখন ভাবছি, তখন অহনার কথায় চৈতন্য ফিরে পেলাম।

- দেখেন, দেখেন, কী সুন্দর দুটো রাজহাঁস।

আমি তাকিয়ে দেখি ছেলে রাজহাঁসটি তার সঙ্গিনীকে পরম মমতায় ঠোঁট দিয়ে আদর করছে। আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম- তারপর, তোমার কেমন চলছে?

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি অহনার চোখে জল, দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে। তারপরই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু

হলো। মনে হলো ওর কষ্টের সাথে বৃষ্টিও একাত্মতা প্রকাশ করলো। আমি আর ওকে কিছু বললাম না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দুজন। তারপর নীরবতা ভেঙে অহনা বললো- আপনি তো পুরোপুরি ভিজে গেছেন। সরি, আমার জন্য এই অবস্থা হলো! কতোদিন ভেবেছিলাম

বৃষ্টি শেষ হওয়ার পর দুজন গিয়ে সেই বেঞ্চিতে আবার বসলাম। তখনও সুন্দর সেই শীতল বাতাস বইছিলো।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। আমিও ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, কী বলবো।

একটু বৃষ্টিতে ভিজবো আর সেই বৃষ্টি ভেজা ঘাসে আমি খালি পায়ে হাঁটবো। চলুন না, একটু বৃষ্টির মধ্যে হাঁটি।

তারপর ও বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের মতো একবার লেকের পদ্ম ফুল দেখায়, একবার লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল গাছের দিকে তাকিয়ে বলে, কী সুন্দর তাই না!

তারপর বৃষ্টির মধ্যে ওর ছোটাছুটি, লাফালাফি আর সে কী উচ্ছ্বাস! কেউ সামনাসামনি না দেখলে আমার দ্বারা সে ঘটনার বর্ণনা করা সত্যি কঠিন।

এরপর অহনা নীরবতা ভেঙে বললো- সাকিব ভাই, আপনার কী অফিসার্স কোয়ার্টারের "ফাহাদের" কথা মনে আছে?

আমি বললাম- হ্যাঁ, মনে আছে। খুব ভালো ছেলে ছিলো।

তারপর অহনা হঠাৎ আমার হাত ধরে অনুনয় করে বললো- আমাকে একটু ফাহাদদের বাসায় নিয়ে যাবেন? আপনার কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। প্লিস, আমাকে একটু নিয়ে

যান না, প্লিস। আমি এই কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কী করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপর অহনার মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে আমি তো রীতিমতো হতবাক!

ফাহাদরাও কলোনির অফিসার্স কোয়ার্টারেই থাকতো। ওর বাবা ওয়াপদার সাব-ডিভিশন ইঞ্জিনিয়ার ছিলো। ফাহাদ যখন ইন্টারমিডিয়েটে আর অহনা ক্লাস নাইনে পড়তো, তখনই তাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক হয়। দুজনের প্রেম এত গভীর হয় যে, পরের বছরেই কাজি অফিসে গিয়ে তারা গোপনে বিয়ে করে ফেলে। তারপর ঘটে সেই করুণ ঘটনা। হঠাৎ করে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে ফাহাদ মারা গেলো। এতবড়ো ধাক্কা এই ছোটো মেয়েটা একলা সামলেছে, কারো সাথে তার মনের কষ্টের কথা এতোদিন শেয়ার করতে পারেনি!

ফাহাদকে এখনও সে মনে মনে স্বামী হিসেবে মনে করে। সে কিছুতেই মন থেকে ফাহাদের স্মৃতি মুছতে পারছে না। সে একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে ওর সাথে কথা বলে।

অহনা বললো- আমরা শরিয়ত মতেই বিয়ে করেছিলাম। একথা বলেই সে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

আমার এখন কী বলা উচিত, কী করবো, কিছুই মাথায় আসছিলো না। পৃথিবীতে মানুষের জীবনে যে কত রহস্য, কত গোপন কথা লুকিয়ে থাকে, আমরা কতোজন তা জানি!

জানেন সাকিব ভাই, আমার আর ফাহাদের প্রিয় মানুষ ছিলেন আপনি। আপনার সংগ্রামটাও আমি কাছ থেকে দেখেছি।

বাসার সামনের মাঠে যখন ফুটবল খেলতে নামতেন, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার খেলা দেখতাম। সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে পিছনে ফেলে আপনি গোলের পর গোল দিয়ে যেতেন। কোনো বাধাকে বাধা মনে করতেন না। আমিও আপনার মতো সব কষ্টগুলোকে জয় করতে চাই।

ওর কথা শুনে আমি ক্ষণিকের জন্য কৈশরের সেই স্মৃতিতে ফিরে গেলাম। আমি বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, একজন, দুজন করে সবাইকে কাটিয়ে আমি শুধু গোল করছি। আমাকে জিততেই হবে, আমার লক্ষ্যে আমাকে পৌঁছাতেই হবে। আজ এই জীবন-যুদ্ধের সংগ্রামেও আমি জিততে চাই, আমার লক্ষ্যে আমি পৌঁছাতে চাই।

তখন আমার প্রিয় শিল্পী Sia- এর গানের কয়েকটা লাইন মনে পড়ে গেল, I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes, I'm invincible, Yeah, I win every single game…

ক্ষণিকের জন্য আমি অন্য জগতে চলে গিয়েছিলাম। অহনার ডাকে হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলাম- সাকিব ভাই, আমি ফাহাদের স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ওকে ছাড়া আমি বাকি জীবন বাঁচবো কী করে?

সব শুনে, আর ফাহাদের প্রতি অহনার ভালোবাসার গভীরতা দেখে আমার একটু লজ্জাবোধ হলো। আমি ভেবেছিলাম অহনা হয়তো আমাকে ভালোবাসে একথা বলতে এসেছে। তাই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে অহনাকে বললাম- চলো, তোমাকে ফাহাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অহনা যেন এই উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিলো। ওর চোখেমুখে খুশির আভা ছড়িয়ে পড়লো। এই আনন্দে সে উচ্ছ্বল হয়ে উঠলো। সারাটা রাস্তা শুধু তার আর ফাহাদের বিভিন্ন স্মৃতি এবং ভালোবাসার কথা বলেই যাচ্ছিলো। আমিও বসে বসে তা শুনছিলাম এই ভেবে যে, বুকের ভেতরে এতদিনের জমানো কথাগুলো বলতে পারলে ও ভীষণ হালকা বোধ করবে। আমরা যথারীতি মিরপুরে ফাহাদের বাসায় পৌঁছলাম। আমাদের দেখে ফাহাদের বাবা-মা ভীষণ খুশি হলো। ওদের মাথায় একবারের জন্য এটা আসেনি যে, আমি আর অহনা একসাথে কেন?

যেদিন কোয়ার্টারের সামনের রাস্তায় ফাহাদের সাইকেলকে একটা ট্রাক পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে চলে গিয়েছিলো, আমি তাকে কাঁধে করে তুলে বেবিট্যাক্সি করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর পাঁচদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে আমাদের চোখের সামনে মারা গেলো ছেলেটা। একমাত্র ছেলে ফাহাদকে হারিয়ে ওর বাবা-মা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলো। তারপর মৃত ছেলের স্মৃতি থেকে বাঁচতে ডেমরা থেকে ট্র্যান্সফার হয়ে তার বাবা মিরপুরে চলে এসেছিলো।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর, ফাহাদের মা আমাকে ধরে ভীষণ কান্নাকাটি করলো। ফাহাদের বাবা বললো- বাবা সাকিব, তুমি মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় একটু এসো, তোমাকে দেখলে মনটাতে একটু শান্তি পাই।

হঠাৎ অহনা ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করলো। এই আকস্মিক ঘটনায় ফাহাদের বাবা-মা হকচকিয়ে গেলো, তারা কিছুই বুঝতে পারছিলো না।

আমি তখন ফাহাদের আব্বা-আম্মাকে সব খুলে বললাম। সব শুনে তারা তো অবাক। পরক্ষণে অহনাকে ফাহাদের আম্মা বুকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ আদর করলো আর বললো- আজ তো ফাহাদ নেই, কিন্তু আমার যদি আরেকটি ছেলে থাকতো, তাহলেও আমি ছেলের বউ করে তোমাকে রেখে দিতাম। কিন্তু তোমার তো ভবিষ্যৎ আছে মা। তুমি

নতুন করে জীবন শুরু করো। ওর স্মৃতি আঁকড়ে থাকলে তো জীবন চলবে না মা। তোমার যখনই মন খারাপ করবে, সাকিবের সাথে চলে আসবে।

ফাহাদের আব্বা-আম্মার ব্যবহার এবং আন্তরিকতায় অহনা বেশ মানসিক প্রশান্তি পেলো। ওর বুক থেকে এতদিনের জমে থাকা পাথরের বোঝা যেন নেমে গেলো। আমরা যথারীতি ফাহাদের বাসা থেকে বিদায় নিলাম।

অহনা বললো- আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাকিব ভাই। আজকে আমার মনটা বেশ হালকা লাগছে। ফাহাদ মনেহয় আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

আমি বুঝলাম, এতদিন অহনা একটা মারাত্মক ডিপ্রেসানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। কারো সাথে তার মনের কষ্টগুলো এতদিন শেয়ার করতে পারেনি।

তখন অহনা বললো- সাকিব ভাই চলেন না, একটু বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে বসি। হলিক্রস কলেজের বান্ধবীদের সাথে একবার এসেছিলাম, খুব সুন্দর জায়গাটা।

আমি আর না বললাম না। তারপর দুজন লেকের পাড়ে একটা গাছতলায় বসলাম। অহনা অনেকক্ষণ ধরে লেকের পানির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। তারপর নীরবতা ভেঙে আমার কাঁধে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো। এরপর প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মতো অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে আমার কাঁধেই পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেলো।

এদিকে পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন ডুবি ডুবি করছে। আমরা যেখানটায় বসেছিলাম সে জায়গাটা এরই মধ্যে বেশ নিরিবিলি হয়ে গিয়েছিলো। তাই আমি বাধ্য হয়েই অহনাকে ডাকলাম- এই অহনা, বাসায় যাবে না।

অহনা ঘুমের ঘোরে বললো- আরেকটু থাকি, আমার বেশ ভালো লাগছে।
- কিন্তু সন্ধ্যে তো হয়ে গেছে। আশেপাশে কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না। আমার মনেহয় আমাদের এখনই ফেরা উচিত।
- না, আমি যাবো না। সবাই আমাকে রেখে শুধু চলে যায়, আপনাকেও আমি হারাতে চাই না।

ওর কথায় আমি চমকে উঠলাম। অহনা আমার হাত শক্ত করে ধরে বললো- বলেন আপনি আমাকে ছেড়ে কখনও দূরে চলে যাবেন না। আমি ফাহাদের মতো আপনাকেও হারাতে চাই না। আপনার মধ্যে আমি ফাহাদের ছায়া দেখতে পাই। ও আপনার মতো হাঁটতো, কথা বলতো, আপনার মতো স্টাইল করতো।

আমি কী বলবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অহনা বললো- চলেন,

তবে আমি কিন্তু কাল সকাল দশটার মধ্যে আবার আসবো। সারাদিন ঘুরবো, একসাথে বাইরে খাবো আর আজকের মতো বৃষ্টি হলে বৃষ্টিতে ভিজবো। আপনি টিউশনি থেকে ছুটি নিয়ে নিবেন। জানেন সাকিব ভাই, আমি অনেকগুলো বাজরঙি পাখি পুষি, আর তাদের সাথে কথা বলি। আজ আমি সব পাখিগুলোকে মুক্ত করে দেবো। আজ আমি ভীষণ খুশি। কী যে ভালো লাগছে, আপনাকে আমি বলে বোঝাতে পারবো না!

এরপর অহনা আমাকে কলাবাগান নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো। যতক্ষণ গাড়ি থেকে ও আমাকে দেখতে পেলো, পিছন ফিরে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলো।

আমার সারাটা রাত ঘুম আসেনি। ওর শরীরের গন্ধে, ভালোবাসার স্পর্শে আমি তখনও আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। ভালোবাসাহীন বেড়ে উঠা একটা ছেলে একটু আদর-যত্ন, ভালোবাসা পেয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখলো।

সকালে উঠেই রেডি হয়ে গেলাম। তারপর শুধু গাড়ির হর্ন শোনার অপেক্ষায়। এরপর সকাল দশটা বেজে এগারোটা, তারপর বারোটা, ঘড়ির কাঁটা শুধু এগিয়েই চলে। আমি বারবার জানালার কাছে যাই আর অহনার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকি। বুকের ভেতর অভিমান বাসা বাঁধতে থাকে। কিন্তু অহনার দেখা নেই!

পরক্ষণেই রেনুর মার চিৎকারে ঘুমটা ভেঙে গেলো। ভাইজান আজকে তো আপনার বাজার করার ডেট, যাইবেন না বাজারে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে মুখে একটু পানির ঝাপটা দিয়ে বাইরে এসে দেখি কেউ নেই। কতক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর বুঝলাম অহনাকে নিয়ে পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন ছিলো। আসলে আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের জীবনে স্বপ্নগুলো স্বপ্নই থেকে যায়। আমাদের স্বপ্ন দেখতে নেই। তাতে কষ্টটা আরো বাড়ে।

তারপর জমে থাকা সব অভিমান আর কষ্টগুলোকে আকাশে উড়িয়ে দিলাম, যেমনি উড়ে পথের ধুলো। দুঃখ আজ তোমায় দিলাম ছুটি। হৃদয়ের মাঝে যখন একাকিত্ব জন্ম নেয়, যখন পারি না এড়াতে, যখন সবকিছু শূন্য মনে হয়, নীল আকাশ যখন সমুদ্রের কাছাকাছি, তারপরে হাওয়া যেই থেমে যায়, আমি উঠে দাঁড়াই, আমি অদম্য হতে চাই, সামনে এগিয়ে যেতে চাই।

তখন স্বপ্নের সেই Sia-র গানের লাইন ক'টা আবারও মনে পড়ে গেলো, I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes, I'm invincible, Yeah, I win every single game...

*****

অধিকার

মো. ওমর গাজী প্রামাণিক
জুনিয়র নাম্বারিংম্যান, কাটিং
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

লাখো শহিদের রক্তে কেনা
বাংলার প্রতি ইঞ্চি মাটি,
সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি
হারানো অধিকার খুঁজি।

স্বাধীন নাকি পরাধীন আমি?
চিৎকার দিয়ে বলি–
অধিকার চাই, অধিকার চাই,
না হয় আমার বুকে মারো গুলি।

আমি বিদ্রোহী বীর আবু সাইদ,
ধিক্কার দিয়ে বলি–
দেখোনি কি তোমরা রক্তে ভিজেছে,
প্রিয় বাংলার পলি।

অনেকেই দেখি টেলিভিশনে বলছে–
শোন হে জাতি,
মায়াকান্না জড়ানো সে কথাগুলো
কেবল শুনে যাওয়াই কি আমাদের নিয়তি!

অশ্রুসিক্ত নয়তো নয়ন
অভিনয়ের সে রানি,
চিৎকার দিয়ে বলছি তোমায়
শুনে যাও, তুমি খুনি।

সত্যটাকে কেন খুন করে আজ
মিথ্যাকে করো সাথি?
মিথ্যা নিয়েই পালাতে হবে–
এটাই নির্মম সত্যি।

একাত্তরের চেতনা বুকে
জালিমের হাতের জুলুম,
হাজারো সাঈদ রক্ত ঝরাবে
মানবে নাতো কারো হুকুম।

দল বেঁধে হাজারো বীর
আসবে মাঠে ছুটে,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভাঙ্গবো ছুড়ে ঢিলে।

বীরের দেশে জন্ম মোদের
আসবো বীরের বেশে,
ঊর্ধ্ব গগণে সূর্যের মতো
উঠে দাঁড়াবো আবার হেসে।

*****

স্বপ্ন

মো. আব্দুল মুত্তালিব
প্রাক্তন লাইন আয়রনম্যান, সুইং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে
পাড়ি জমিয়েছি ঢাকা,
ভালো একটা চাকরি পেয়ে
বদলাবো ভাগ্যের চাকা।
ব্যাবিলন পরিবারে চাকরি পেয়ে
ভাগ্যের চাকা ঘোরে,
কর্মমুখর জীবনের মাঝেও
মনে অনেক স্বপ্ন জাগে।

ব্যাবিলনে দুর্নীতি, বিচ্ছেদ-বৈষম্যের
নেই তো কোনো প্রশ্রয়,
বেকারত্বের অভিশাপ ঘুচিয়ে
ব্যাবিলনে পেয়েছি আশ্রয়।
ভিন্ন গাঁ-ভিন্ন জেলা ডথেকে এসে
মিলেমিশে সবাই কাজ করি,
ব্যাবিলন পরিবারে নানান সুবিধা পেয়ে
স্বপ্নের বাস্তবায়ন করি।

জীবনের ধাঁধাঁ

আম্বিয়া
অপারেটর, সুইং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আজ কষ্ট আমায় দিচ্ছে তাড়া
অশ্রু আমার বাঁধন হারা
বইছে দেখ অবিরত
বুক পাঁজরে করছে ক্ষত।

হাসছে দেখ হাজার মানুষ
দূর আকাশে উড়ছে ফানুস
উড়বো আমি তেমন করে
রাখবে কে আর আমায় ধরে!

মানবো না আর কোনো বাধা
জীবন মানে জটিল ধাঁধাঁ
ভাঙবে কি এই ধাঁধাঁর খোলস
ভাসবে কী আর ভরা কলস!

*****

বিভীষিকাময় দিনগুলো

উম্মে সালমা ডালিয়া
এজিএম, ক্যাড অ্যান্ড প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আজ ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সদ্য স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশের ১ম মাস পূর্তি। গত ৫ আগস্ট আমাদের ছাত্রছাত্রীসহ আপামর জনতার মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে এবং সৃষ্টিকর্তার প্রত্যক্ষ সাহায্যে, সুদীর্ঘ ১৫ বছর ৭ মাসের স্বৈরাচার সরকারের প্রধান, শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিলাম আমরা। কিন্তু এই বিজয় অর্জন করতে আমাদের অনেক অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। আবু সাঈদ, মীরমুগ্ধ ও আনাস সহ আরও অনেক তরুণদের তাজা প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই বিজয়। এই আন্দোলনের প্রত্যেকটা মৃত্যু বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে ব্যথিত করেছে তো বটেই, পৃথিবীর সকল বিবেকবান মানুষের বিবেককেও নাড়িয়ে দিয়ে গেছে।

আবু সাঈদের মৃত্যুর খবরটা অফিসে থাকতেই আমি পাই। তখন আমরা মিটিং-এ ছিলাম, মিটিং শেষ করে ফেইসবুকে ভিডিওটা দেখে বোধশূন্য হয়ে গেলাম। পরের দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় আবু সাঈদের বোনের আহাজারির ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। আমিও সেটা দেখলাম এবং জানলাম আবু সাঈদ ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছিলো। মুহূর্তেই মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল, কারণ ওকে তো আমি দেখেছি। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি আমি ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি কার্যনির্বাহী পর্ষদে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলাম। এ প্রকল্পের স্বপ্নদ্রষ্টা, মাননীয় পরিচালক আবিদুর রহমান স্যার আমাকে এই টিমে সংযুক্ত করেছিলেন। ২০০৮ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষ শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত প্রথম ব্যাচের অনুষ্ঠান করে ২০০৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী ১ম কিস্তির টাকা প্রদান করেন।

আমরা সবাই জানি ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারীতে তৎকালীন বিডিআর এ এক ভয়ংকর এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশে আর্মির ৫৭ জন চৌকষ অফিসারসহ মোট ৭৪ জন নিহত হয়। এ হত্যাকাণ্ড ২৫ ফেব্রুয়ারীতে শুরু হলেও শেষ হয় ২৬ ফেব্রুয়ারী বিকেলে বা রাতে। বিডিআর জওয়ানরা বেশ কিছু সংখ্যক অফিসারদের পরিবারের সদস্যদের ২৭ তারিখ পর্যন্ত আটকে রাখে। আমি

জানি না কার কেমন স্মৃতি আছে এ দিনগুলোর, আমার খুব ভালো মনে আছে। কারণ তখন এসএসসি পরীক্ষা চলছিলো। আমার বড় ছেলে বিএএফ শাহিন স্কুলে পড়তো। ওর পরীক্ষার সিট পড়েছিলো শহীদ রমিজউদ্দিন স্কুলে। ওই দিন আনুমানিক সকাল দশটার দিকে ট্র্যান্সপোর্ট এজিএম সবুজ ভাইয়ের রুমে গেলাম গাড়ির জন্য, আমার ছেলেকে দুপুর বেলা আনতে যেতে হবে। উনিই আমাকে জানালেন যে, "পিলখানাতে কিছু সমস্যা হয়েছে, গোলাগুলি হচ্ছে, আপনি কিভাবে ছেলেকে আনতে যাবেন ওটাতো ক্যান্টনমেন্ট এর ভিতরে" আমার তখন অবস্থা হচ্ছে আহত বাঘিনীর মতো। আমি ভাবলাম গাড়ি না দিলে নাই আমি একাই যাবো, যেতে তো আমাকে হবেই কারণ আমার সন্তান ওখানে আছে। ওকে আনতে হবে নিরাপদে। তবে শেষ পর্যন্ত সবুজ ভাই গাড়ি দিয়েছিল, অনেক ধন্যবাদ জানাই সবুজ ভাইকে। যা হোক আমি আমার ছেলেকে নিরাপদেই বাসায় পৌঁছাতে পেরেছিলাম।

আমাদের শিক্ষাবৃত্তির অনুষ্ঠান এই অবস্থার মধ্যে হবে কিনা সেটা নিয়ে মিটিং করা হয় এবং বেশির ভাগেরই মতামত ছিলো অনুষ্ঠানের তারিখ পিছানোর জন্য। কিন্তু যেহেতু স্টুডেন্টরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসবে এবং এদের সবার মোবাইল ফোনও ছিলো না এমনকি এদের ঢাকায় আসার জন্য ভাড়ার টাকাও ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলো, এছাড়াও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির সাথে যোগাযোগ করলে উনি অনুষ্ঠানে আসার জন্য রাজি ছিলেন। তাই আমরা ২৬ তারিখেই অনুষ্ঠানটা করি। স্যাররা চেয়েছিলেন ব্যাবিলনের শিল্পকারখানা গুলো শিক্ষার্থীদের পরির্দশন করাবেন, আর এই দায়িত্বটা এসে পড়ে আমার উপর। যেহেতু আমি প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারদেরকে চিনতাম তাই আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষার্থীদেরকে সে সকল প্রতিষ্ঠান ভিজিট করিয়ে আনার জন্য। সেদিন ঢাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিলো, অফিসে বসেও গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। এরমধ্যেই আমরা স্টুডেন্টদেরকে সবগুলো ইউনিট দেখিয়ে এনেছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেশের প্রত্যেকটি জেলা থেকে মেধাবী কিন্তু দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদেরকে অনুষ্ঠান করে বৃত্তি দিতাম। এই সব কাজে যুক্ত থাকার কারণে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক তৈরি হতো। অনেকের কষ্টের কথা আমাদেরকে ভীষণ ছুঁয়ে যেত।

২০১৬ সালেও শিক্ষাবৃত্তির আয়োজন করা হয়, এই ব্যাচেই ২০২৪ এর আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া অন্যতম শহিদ আবু সাঈদ-ও ছিলো। বলতে গেলে আবু সাঈদের মৃত্যুর পরেই কোটা আন্দোলন সরকার

পতনের অন্দোলনে রূপ নেয়। ১৬ই জুলাই আবু সাঈদের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের ছাত্র/ছাত্রীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কোটা আন্দোলনটা শুরু হয়েছিলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিন্তু নিরস্ত্র আবু সাঈদের উপর পুলিশের গুলি চালাবার প্রতিবাদে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও রাস্তায় নেমে পড়ে। প্রত্যেক অভিভাবককে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়, তাদের বাচ্চাদের ঘরে আটকে রাখতে। একটা পর্যায়ে কলেজ ও স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরাও রাস্তায় নেমে আসে। প্রত্যেক দিন অফিসে যাচ্ছি আর হতাহতের খবর পাচ্ছি। মনটা খুবই অস্থির, কারণ আমার ঘরেও একজন ছাত্র আছে। আমার ছোটো ছেলেকে অফিসে আসার সময় বলে বের হই যে বাবা তুমি কিন্তু মিছিলে বা কোনো কর্মসূচিতে যাবে না। সেও মাথা নাড়িয়ে সায় দেয়, সে যাবে না, কিন্তু আমি বুঝতাম সে প্রতিদিনই যেত। বাসায় এসে আবার বুঝাতাম, ও আমাকে সরকারি বাহিনীর নির্মমতার ভিডিও দেখাতো, আমি ওগুলো দেখতে চাইতাম না কিন্তু ও আমাকে জোর করে দেখাতো। প্রত্যেক দিন অসংখ্য নির্যাতন, মৃত্যুর অডিও-ভিডিও আমাকে দেখতে হতো। আমি ভীষণ ভয় পেতাম, আবার আমার এটাও মনে হতো যে আমাদেরও আন্দোলনে যাওয়া উচিত। আমাদের সন্তানেরা এত কষ্ট করছে আর আমরা যেতে পারছি না। এক পর্যায়ে সরকার সমস্ত কিছু বন্ধ ঘোষণা করলে আমাদের অফিসও বন্ধ দিয়ে দেয়। একদিকে কারফিউ অন্যদিকে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকার চূড়ান্ত আঘাত হানে দেশবাসীর উপর। ততদিনে ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে অভিভাবকরাও রাস্তায় নেমে পড়েছেন।

৪ আগস্ট কারফিউ চলছে কিন্তু অফিস খোলা, অফিসে যেতে হবে। রাতেই আমার ছোটো ছেলে আমাকে নিষেধ করেছিলো যেন অফিসে না যাই, রাস্তায় ঝামেলা হতে পারে। আমি ওকে কিছু বলিনি, কিন্তু মনেমনে বলেছি আমিতো যাবোই। যাহোক, সকাল বেলা যখন আমি তৈরি হয়ে বের হচ্ছি দেখি আমার ছেলে রেডি হচ্ছে আমাকে অফিসে পৌঁছে দেবার জন্য। আমি ওকে নিবো না, কিন্তু ও যাবে। শেষ পর্যন্ত ও আমার রিকশায় উঠে পড়লো, আমাকে অফিসের গেটে নামিয়ে দিয়ে সিনেম্যাটিকভাবে দুই হাত প্রসারিত করে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, কপালে চুমু খেলো এবং বলল, "আমি যাচ্ছি আন্দোলনে, বেঁচে ফিরলে আবার দেখা হবে"। এতদিন ও যাচ্ছিলো লুকিয়ে লুকিয়ে, আজ আমার থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। আমি যেনো স্ট্যাচু হয়ে গেলাম, মিনমিনে গলায় বললাম, "যেও না"। ও শুনতে পেলো না, ওই রিকশাতেই ফিরে গেল। সারাদিন আমি অফিসে কাজ করেছি কিন্তু আমার

বুকের মধ্যে খুব হাহাকার হচ্ছিলো। অসংখ্য বার ফোন করেছি, দু'এক বার রিসিভ করেছে, কিন্তু তেমন কোনো কথা বলেনি, শুধু বলেছে, "মা আমি সেইফ আছি, ভালো আছি"। আমিও খোঁজ রাখছিলাম, ঢাকার প্রত্যেকটা জায়গার, যেখানে আন্দোলন চলছে। আমি আগেই জেনেছি যে আমার ছেলে ও তার বন্ধুরা সাইন্সল্যাব এর পয়েন্টে থাকবে। দুপুরের পর থেকেই জানতে পারলাম সাইন্সল্যাব এলাকার ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি আহত হচ্ছে এবং বিপদে আছে। আমার হার্টবিট দ্রুত হতে লাগলো। বিকেল ৩টা থেকে ছেলেকে রিকোয়েস্ট করেছি বাবা ফিরে এসো। ওর একই কথা, "আসছি মা, আমরা সেইফ আছি, চলে আসবো ৪টার মধ্যে"। কিন্তু ৪টা থেকে ৫টা বেজে গেল, আমার ছেলে আসে না। এরপরে জানলাম ও আজ আর বাসায় আসতে পারবে না, একে তো কারফিউ চলছে, আবার রাত হয়ে গেছে। আমি কী করবো বুঝতে পারছিলাম না, ছেলেকে ফোন দেই সে ফোন রিসিভ করে না। ওর বন্ধুকে ফোন দেই সে ফোন ধরে বলে, "আন্টি আমরা পপুলার হাসপাতালে আটকা পড়েছি। বাইরে পুলিশ ও সরকারি দলের ছেলেরা আছে, বের হলে মেরে ফেলবে"। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তখন একজন মায়ের মনের কী অবস্থা হতে পারে। পরে জেনেছি যতক্ষণ হাসপাতালে ছিল, ওরা সকল আহত ছাত্রদেরকে চিকিৎসা পেতে সাহায্য করেছে। অনেক রাতে খবর পেলাম কোনো মতে হাসপাতালের পিছন দিক দিয়ে ধানমণ্ডির কোনো একটা গলিতে ওর এক বন্ধুর বাসায় চলে যেতে পেরেছে। কিন্তু আমি আর সারারাতে ওর সাথে কোনো যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। সেদিনের রাতটা যেন আর শেষই হচ্ছিলো না।

সকাল হতেই টিভি অন করে দেখলাম সরকার খুবই কঠিন অবস্থানে আছে। ওইদিন ঢাকার উদ্দেশে লংমার্চের ডাক দিয়েছিল ছাত্ররা। ইন্টারনেট বন্ধ, ভিপিএন দিয়ে ইউটিউব দেখার চেষ্টা করলাম, ভালোমতো দেখতে পারলাম না। ছেলের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না, বাসার সবাই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলো, বলল আমার প্রচণ্ড আগ্রহেই নাকি ও আন্দোলনে চলে গেছে। ওর যদি কিছু হয় তাহলে আমিই দায়ী থাকবো। এমনিতেই আমি ভীষণ বিধ্বস্ত ছেলের খোঁজ না পেয়ে, আর সবাই আমাকেই দুষছে। আমার ভাই ফোন করছে, বোন ফোন করছে, ওর কোনো খবর পেয়েছি কিনা জানার জন্য। আমি ভাবছি ও বেঁচে আছে তো? আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, কোনো কাজ করতে পারছি না। শুধু ছেলেকে ফোন দিয়েই যাচ্ছি, প্রত্যেক টিভি চ্যানেলে একই জিনিস দেখাচ্ছে। কোথাও ছাত্ররা নেই শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোক রাস্তায় টহল

দিচ্ছে। এমনভাবে কেটে গেল আরও কিছু সময়, প্রায় দুপুর বারোটার কাছাকাছি সময়ে আমি আমার চতুর্থ ভাই যিনি এক সময় ডিফেন্সে ছিলেন, তাকে অনুরোধ করলাম আমার ছেলেটাকে খুঁজে দেওয়ার জন্য। ভাইয়া তখন আমাকে আশ্বস্ত করলো যে, "অবস্থা ভালো, টেনশন করো না"। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, ভাইয়া বলল, "রাস্তায় অনেকে নেমে পড়েছে, স্বৈরাচার বিদায় হচ্ছে"। তারপরও ভরসা পাচ্ছিলাম না। বেলা ১টার দিকে টিভিতে ব্রেকিং নিউজ এলো যে সেনাবাহিনীর প্রধান জাতির উদ্দেশে কিছু বলবেন। তখন আমি বুঝলাম, ভাইয়া আমাকে ঠিকই বলেছে। আবারও ফোন দিলাম ছেলেকে, এবার ওকে পেলাম, খবরটা জানালাম এবং ওকে বাসায় আসতে বললাম, কিন্তু সে বললো, "এখনো রিস্ক আছে পরে আসবো"। অপেক্ষার প্রহর যেন আর শেষই হচ্ছিলো না। সেনাপ্রধানের ব্রিফিং-এর সিডিউল বারবার বদল হচ্ছিলো, আর অপেক্ষা করতে না পেরে আমি এবং আমার বোনসহ আরও অনেকেই বেরিয়ে পড়লাম। বাসার নিচে নেমে এসে দেখলাম এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, দলে দলে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে সবার মুখে বিজয়ের হাসি। আমরা দু'বোনও যোগ দিলাম, প্রত্যেক বিল্ডিং থেকে মানুষ বের হয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, আমরা জোরে জোরে বিগত সরকারের দুঃশাসন নিয়ে কথা বলছি। আমি একটা কথা বলছি, পাশ থেকে আরেক জন উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। আমরা অকারণে হাসছি, কেউ কিন্তু কাউকে সেভাবে চিনিও না। কিন্তু খুবই আন্তরিকভাবে একে অপরের সাথে কথা বলছি, মনে হচ্ছিলো অনেক দিন আমরা কথাই বলিনি, এই মাত্র কথা বলার অনুমতি পেলাম। আমরা কিন্তু গন্তব্যহীনভাবে হাঁটছিলাম, এ চলার যেন শেষ নেই, নেই কোন ক্লান্তি।

আমি ১৯৭১ এর বিজয় দেখিনি কিন্তু ২৪শে দেখলাম। এতো আনন্দ পেয়েছি যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমাদের প্রত্যাশা সবার প্রচেষ্টা এবং অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা যেন অটুট থাকে। আর কোনো স্বৈরাচার যেন বাংলার জমিনে তৈরি না হতে পারে। আমরা যেন অন্তত নির্ভয়ে মন খুলে কথা বলতে পারি।

*****

স্বপ্নের শহরে জীবন-জীবিকার গল্প

মাকসুদা খাতুন
সিনিয়র ওয়েলফেয়ার অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

মে ১৭, ২০২৩- বুধবার। আনুমানিক বিকাল ৩ ঘটিকার সময় ধানমণ্ডি লেকের পাশ দিয়ে হাঁটছি। চতুর্দিকে রোদের তীব্রতা আর গাছের শুকনো পাতার পায়ের নিচে পড়ে মড় মড় শব্দ, কোনোটাই আমার কানে আসছে না। কারণ আজ আমার অফিসে একটা বড়ো ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মনটা খুব খারাপ। আজ আমি আমার কাজের প্রাপ্তি পেলাম! বুঝতেই পারছিলাম না কেন আমার চাকরিটা গেলো। কর্তৃপক্ষকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে চাকরিটা আমার কতোটা দরকার। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো ভাবেই বুঝতে চাইলো না। চাকরি করে এতদিনে তেমন কিছুই করতে পারিনি। এই স্বল্প আয়ে তিনজনের সংসার চালানো অনেক কষ্টকর কিন্তু তারপরও আমার সহধর্মিণী এতোটাই হিসাবি যে কাউকে কোনো কিছু বুঝতে দেয় না। এই অল্প ক'টা টাকায় সুন্দরভাবে চালিয়ে নেয়। কিন্তু এখন কী হবে? বাসায় গেলেই তো মেয়ে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে বাবা তার জন্য কী নিয়ে এসেছে। এসব ভাবতেই আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে বাবা হিসেবে নিজেকে ব্যর্থ মনে হয়। জীবনে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য প্রতিনিয়তই কাজ করতে হয়। তারপরও আমরা পারি না যোগ্য হয়ে উঠতে। তাতে কি মনোবল হারানো যাবে? না। ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। অন্তত পক্ষে আমার মেয়ে যাতে করে নতুন ভাবনা নিয়ে আগামীর পথে এগোতে পারে সে ব্যবস্থাটা আমাকে করে যেতে হবে।

মে ১৮, ২০২৩। সকালে আর ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করছে না, খুব টেনশন কাজ করছে। আমার স্ত্রী আর আমার ছোট্ট মেয়েটি আমাকে বার বার ডাকতে থাকে ঘুম থেকে উঠার জন্য তবুও আমার উঠতে ইচ্ছা করছে না, কারণ আজ কাজে যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। কিন্তু তাদের ডাকাডাকিতে আমি উঠতে বাধ্য হই।

ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে রেডি হয়ে বের হয়ে গেলাম কোনো কিছু করার উদ্দেশে। বের হওয়ার সময় মেয়েটা বার বার আমাকে মনে করিয়ে দেয় ফেরার সময় তার জন্য খেলনা কিনে

আনবার জন্য। এতটাই মায়াভরা মুখে বলে যে তার উপর রাগ না করে আস্তে করে সম্মতি দিয়ে বের হয়ে গেলাম। পরক্ষণে আমি ভাবতে থাকি যে, বাবা হলে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়।

এখন কোথায় যাবো, কী করবো কিছুই ভাবতে পারছি না। কিন্তু কিছু তো একটা ভাবতে হবে। বাসার কিছু দূরেই একটি খেলার মাঠ আছে, সেখানে একটি গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছে গাছটি আমকে ছাতার মতো ছায়া দিচ্ছে। গাছের পাতাগুলো আমাকে হাতপাখার মতো বাতাস করে আমার মনটাকে শীতল করছে। সেখানটায় বসে ফোনে কয়েকজনের সাথে কথা বললাম চাকরির জন্য। বেতন যাই হোক না কেন, চাকরি একটা হলে কোনো মতে সংসারটা চালাতে পারবো। কিন্তু সব জায়গা থেকে হতাশ হলাম। কোনো জায়গায় লোক নিচ্ছে না, কী করবো ভাবতে পারছি না। আমরা যারা স্বল্প আয়ের চাকরি করি, তারা কোনোদিন মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে পারি না! মাঠ থেকে বের হয়ে দেখলাম এক লোক বাদাম বিক্রি করছে। দূর থেকে তাকে দেখলাম আর ভাবলাম যে এই বাদাম বিক্রি করেই সে তার জীবিকা নির্বাহ করছে। তার উপার্জনের টাকা দিয়েই সে সংসার চালায়, টিকে থাকার কী অদম্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাকে। সেখান থেকে আবারও হাঁটা শুরু করলাম কোনো এক অনিশ্চয়তার দিকে। ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকি কী করা যায়। হঠাৎ বিকেল হয়ে গেলে আমাদের মহল্লায় এসে পড়ি। দেখি ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। তাদের দেখে খুব ভালো লাগলো। মনে হলো আবার যদি ওদের বয়সে ফিরে যেতে পারতাম, যেখানে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। বাসায় যাওয়ার আগেই চোখে পড়লো একজন লোক বিভিন্ন ধরনের জিনিস বিক্রি করছে। কাছে যেয়ে দেখলাম বিভিন্ন ধরনের বাদাম, খেজুর, আমলকি, বিভিন্ন রোগের বনজ ফল। অনেকেই শরীর ঠিক রাখার জন্য ঔষধ-এর পরিবর্তে সেগুলো খেয়ে থাকে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে এগুলোর ভালো চাহিদা। সবাই সেগুলো কিনতে ভিড় জমাচ্ছে। অনেক কৌতূহল নিয়ে আমি তার সাথে কথা বলি এবং তাকে জিজ্ঞাসা করি, "কিছু মনে করবেন না ভাই, আপনি যে ব্যাবসা করছেন তা কীভাবে করছেন? কোথা থেকে জিনিস নিয়ে আসছেন? কেমন বিক্রি হয় এবং দিন শেষে কেমন আয় হয়?" আমার কৌতূহল দেখে তার খুব ভালো লাগলো এবং সে আমাকে অকপটে সব জানালো। সে এই জিনিস চকবাজার থেকে নিয়ে আসে এবং দিন শেষে তার আয় হয় প্রায় ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা। শুনে আমি তো অবাক। হঠাৎ ভাবি যে আসলেই তো! যেকোনো সৎ কাজ স্বাধীনভাবে

করলেই তো সফলতা আসবে। বাসায় ফিরে গিয়ে দেখি বাসায় অন্ধকার। জিজ্ঞেস করাতে আমার স্ত্রী বললো যে বিদ্যুৎ বিল না দেওয়ার কারণে লাইন কেটে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়িওয়ালার কাছে যেয়ে অনুরোধ করি যে এবারের মতো বিদ্যুৎ-এর সংযোগ দিয়ে দেন, আমি টাকা পরিশোধ করে দিবো। তিনি আমার কথায় বিদ্যুৎ-এর সংযোগ দিয়ে দেন। বাসায় ফিরে দেখি মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে ডাকতে আমার সহধর্মিণীকে নিষেধ করলাম। খাবার খেয়ে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলাম। চোখ বন্ধ করলেই কী হবে! মাথায় সারক্ষণ শুধু চিন্তা, কী করবো?

সবকিছু চিন্তার অবসান ঘটিয়ে এবার স্ত্রীর কাছে নিজের চাকরি চলে যাওয়ার কথা শেয়ার করলাম। প্রথমে সে একেবারে ভেঙে পড়লো, পরে আমার কথা ভেবে নিজেকে সামলে নিলো। আমি তাকে বললাম, "আমি আর চাকরি করবো না বলে ঠিক করেছি, ভাবছি ব্যাবসা করবো, নিজে কিছু করবো। এতো অনিশ্চয়তার মধ্যে আর চলতে পারছি না। কিন্তু ব্যাবসা করার জন্য টাকা কোথায় পাবো সেটা নিয়ে যতো টেনশন।" এবার স্ত্রী আমাকে সাহস দিলো। অল্প কিছু জমি বিক্রি করার কথা ভাবলাম আর আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার দেনা করে নিজের স্বাধীন ব্যাবসা শুরু করার চিন্তা করলাম। যেই ভাবা সেই কাজ। পরের দিন নেমে পড়লাম। কী ব্যাবসা করবো তার বিষয় বস্তু নিয়ে ভাবলাম। রাস্তার ধারে গরম গরম কোনো নাস্তার আইটেম বিক্রি করলে কেমন হয়! বিকালের পরে মানুষ যখন ঘরমুখী হয় এবং সন্ধ্যার নাস্তা হিসেবে কিছু খেতে চায়, তখন এই ধরনের খাবারের চাহিদা বেশি থাকে।

এরপরে দেরি না করে টাকা সংগ্রহ করে ব্যাবসা শুরু করে দিলাম। খুব ভালো লাগছে স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করছি। ভালো লাগে এই ভেবে যে পরিবারের চাহিদা এখন পূরণ করতে পারছি। এই শহর আমাকে আমার ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে, ধন্যবাদ এই শহরকে।

*****

চাও ফ্রায়ার ফিসফিস

মো. শাহজালাল মিয়া পলাশ
প্রাক্তন এজিএম, ইনফরমেশন টেকনোলজি
ব্যাবিলন গ্রুপ

এক.

জামিল, শিরিন ও তাদের সাত বছরের ছেলে শান্ত - থাইল্যান্ডের সুবর্ণভূমি বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে ব্যাংককের ব্যস্ত রাস্তায় যখন পা রাখলো তখন দুপুর দুইটা। বাতাসে ভারী আর্দ্রতার সাথে মিশে ছিলো রাস্তার বিভিন্ন মুখরোচক খাবার ও গ্রিল করা মাংসের সুঘ্রাণ।

হোটেলের দিকে ট্যাক্সি যাত্রা ছোট্ট শান্তর জন্য যেন ছিলো নতুন এক বিস্ময়। সে তার ছোটো নাক গাড়ির জানালার সাথে ঠেকিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে দেখছিলো শহরের উঁচু উঁচু ভবন, রঙিন সব দোকানপাট এবং ট্র্যাফিকের ভেতর দিয়ে ছুটে চলা অগণিত মোটরবাইক। শহরটি যেন রঙে ভরপুর, রাস্তায় রাস্তায় রঙিন সব স্ট্রিটফুডের দোকান আর আকাশের দিকে উঠে থাকা বিলবোর্ডে টাঙানো রংবেরঙের বিজ্ঞাপন যেন একটি অ্যাডভেঞ্চারের প্রতিশ্রুতি হিসেবে তাদের অপেক্ষাতেই ছিলো।

ফোর সিজন হোটেলটি ব্যাংকক শহরে চাও ফ্রায়া নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা ঠিক যেন চাও ফ্রায়া নদীর দিকেই তাকিয়ে আছে। তারা যখন হোটেলটির বিশাল লবিতে প্রবেশ করে শিরিনের তখন চোখ পড়ে হোটেলটির অপরূপ ইন্টেরিয়র ও নকশার দিকে। হোটেলের রিসেপশনে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের চেকইন সম্পূর্ণ হলো, অভ্যর্থনা কর্মীরা তাদের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে জানালো - "সোয়াদি কা"।

তাদের জন্য বরাদ্দকৃত পঞ্চম তলার ৫২৭ নম্বর রুমটি বেশ প্রশস্ত, জানালার পাশে দাঁড়ালে পুরো শহরটা এবং চাও ফ্রায়া নদীর অনেকটুকু দেখা যায়। জামিল শিরিনের কাঁধে হাত রেখে বললো, - "আমরা অবশেষে এখানে চলে এলাম, আশা করছি আমাদের এবারের ভ্রমণটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে"।

আজকে আর তারা দূরে কোথাও যাবে না। তাই হোটেলে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে সন্ধ্যার পর পাশের একটা রেস্তোরাঁ থেকে রাতের খাবার সেরে নিলো। আগামীকাল সকাল থেকে প্রায় সারাদিন তাদের অনেকগুলো জায়গায় ঘোরাঘুরি করার কথা রয়েছে, সকালবেলায় গ্র্যান্ড প্যালেস তারপর সিয়াম প্যারাগন আর টেম্পল অফ ডন।

দুই.

একটি রৌদ্রজ্জ্বল সকাল, ট্যাক্সিতে করে ওরা যখন গ্র্যান্ড প্যালেসের সামনে এসে নামলো তখন সকাল দশটা। গ্র্যান্ড প্যালেসের সৌন্দর্য ওদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেলো। এর সোনালি চূড়াগুলো সূর্যের আলোতে ঝলমল করছিলো আর মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা মোজাইকগুলো যেন প্রাচীন সময়ের গল্প ফিসফিস করে বলছে সবাইকে। জামিল এবং শিরিন গাইডের কথা শুনতে শুনতে ঘুরছিলো আর ছবি তুলছিলো। পাশেই শান্ত মনের আনন্দে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছিলো।

কয়েক ঘণ্টা ধরে প্যালেসের মাঠে ঘোরাঘুরির পর একটু বিরতির আশায় এবং স্ট্রিটফুডের টানে তারা রাস্তার দিকে চলে এলো।

গ্র্যান্ড প্যালেসের আশপাশের রাস্তাগুলি ছিলো প্রাণোদ্দীপনায় ভরপুর। পর্যটক আর স্থানীয়দের হাসি ও কথোপকথনের শব্দ যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিলো। এরই মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে অনেক সময় পার হয়েছে, হঠাৎ করেই যে ন শিরিন তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে একটু টান অনুভব করলো, সে ভাবলো কারো সাথে হয়তো ব্যাগটা লেগে গিয়েছে। ঠিক এমন সময়েই জামিলের চিৎকার তার কানে এলো, "শিরিন"! মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে শিরিন দেখলো তার হ্যান্ডব্যাগের চেইন খোলা, আর খাকি প্যান্ট ও কালো টি-শার্ট পরা একটি লোক তার ফোনটি নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

"চোর! চোর!" বলে চিৎকার করে উঠলো শিরিন! ততক্ষণে লোকটা দেয়ালের আরেক পাশে চলে গেছে, এর ঠিক দুই-তিন হাত পেছনে জামিল দৌড়াতে লাগলো। অবশেষে যখন লোকটি আরেকটি গলির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলো, তখন জামিল একটি লাফ দিয়ে তাকে ধরে ফেললো। জামিল আর চোরের মধ্যে অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি হলো। একপর্যায়ে জামিল চোরের কাছ থেকে ফোনটি কেড়ে নিতে সক্ষম হলো। ইতোমধ্যে সেখানে একটি ভিড় জমে গেছে। কিছু স্থানীয় লোক এসে জামিলকে সহায়তা করলো, তারা চোরটিকে ধরে রেখে পুলিশে ফোন দিলো। ততক্ষণে শিরিনও সেখানে চলে এসেছে। সে

দেখলো জামিলের এক হাতে তার ফোনটি ধরা, জিজ্ঞেস করলো, - "তুমি ঠিক আছ তো?"

এর ঠিক চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ চলে এলো। চোরের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে গাড়িতে করে নিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় থাই ভাষায় চোরটি জামিল ও শিরিনের উদ্দেশে আঙুল তুলে উচু স্বরে কিছু বলতে বলতে যাচ্ছিলো। দিনের বাকি সময়টা ঘটনাটি ভুলে থাকার চেষ্টা করলো তারা। কিন্তু আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করবার পরেও কোনোভাবেই দুপুরে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি মন থেকে সরাতে পারছিলো না ওরা।

তিন.

সন্ধ্যা নেমে এলে তারা তাদের হোটেলে ফিরে এলো। শান্ত তার সারাদিনের সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার থেকে ক্লান্ত হয়ে, দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু জামিল আর শিরিনের মধ্যে এক রকমের অস্থিরতা বিরাজ করছিলো। তারা বারান্দায় বসে আজকের দিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি চিন্তা করছিলো।

বারান্দা থেকে বাইরের দৃশ্যটি ছিলো মনোমুগ্ধকর। চাও ফ্রায়া নদী শহরের আলোতে ঝলমল করছিলো। পাশ দিয়ে ছুটে চলা গাড়ির হর্নের শব্দ আর নদী থেকে ভেসে আসা হালকা বাতাস এক ধরনের বিচিত্র শব্দের সৃষ্টি করেছে। হঠাৎ করেই জামিলের নজর তীক্ষ্ণ হয়ে এলো, নিচের রাস্তায় কোনো কিছু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রাস্তার ওপারে, একটি ছোটো গলির ছায়ায়, একদল লোক চুপিচুপি কথা বলছিলো। এর মধ্যে একটি মুখ ছিলো স্পষ্ট, গ্র্যান্ড প্যালেসের সেই চোরটি। জামিলের হৃদস্পন্দন যেন থেমে যাবে, সে ফিসফিস করে বললো, "শিরিন"! তার কণ্ঠ ছিলো স্থির কিন্তু উত্তেজিত- "ওই দিকে তাকাও" বললো সে। শিরিন তার দৃষ্টি অনুসরণ করলো এবং কাঁপা গলায় বললো, "ও এখানে কী করছে? আমি তো ভাবছিলাম পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে"। "তারা তো ধরে নিয়েই গিয়েছিলো" জামিল উত্তর দিলো। "কিন্তু সে মনে হয় ছাড়া পেয়েছে এবং দলবল নিয়ে এসেছে"। তারা দুজনেই বুঝতে পারলো চোরটি দলবল নিয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছে। দলটি হোটেলের প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো। মনের অজান্তেই জামিল বলে উঠলো, "আমাদের এখনই এখান থেকে বেরোতে হবে"।

চার.

শিরিন দ্রুত শান্তকে জাগিয়ে তুললো। সে ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে এদিক ওদিক দেখছিলো। "মা, কী হচ্ছে?" সে জিজ্ঞেস করলো, তার কণ্ঠে ঘুমের আবেশ। "আমরা একটা অ্যাডভেঞ্চারে

যাচ্ছি" শিরিন হালকা স্বরে বললো। যেন উত্তেজনা লুকাবার চেষ্টা করছে। সে শান্তকে বিছানা থেকে নামাতে নামাতে বললো, "কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে"। জামিল দ্রুত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে ছোটো একটি ব্যাগে ভরলো। "আমরা প্রধান দরজা ব্যবহার করতে পারবো না" সে চিন্তা করে বললো- "ওরা ওখানেই নজর রাখছে। আমাদের অন্য কোনো পথ বের করতে হবে"। এরপর তারা ধীরে ধীরে রুম থেকে বেরিয়ে পেছনের সার্ভিস এক্সিট দিয়ে বাইরে চলে এলো।

হোটেল থেকে বেরিয়েই তারা এক সরু- অন্ধকার গলিতে পা রাখলো। রাতের ঠান্ডা বাতাস শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু তাদের হৃৎপিণ্ড উত্তেজনায় বেজে চলছিলো। তারা দ্রুত অন্ধকার গলির পথে পা ফেলতে লাগলো। প্রতিটি শব্দ যেন তাদের আরও সজাগ করে তুলছিলো। অবশেষে, জামিল একটি ট্যাক্সি দেখতে পেলো। চালককে ভাঙা ইংরেজিতে বললো যে তাদের দ্রুত শহর ছাড়তে হবে। চালক জামিলের কথা শুনে, তাদের তাড়াহুড়োর গুরুত্ব বুঝে গাড়ি স্টার্ট করলো। ট্যাক্সি দ্রুত ব্যাংককের রাস্তায় ছুটতে লাগলো। জামিল বারবার পিছনে লক্ষ রাখছিলো কেউ তাদের ফলো করছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে।

পাঁচ.

এসময় ব্যাংককের রাস্তাগুলো গাড়িতে ভরপুর থাকে। জামিল তাদের ট্যাক্সি ড্রাইভারকে অনুরোধ করলো কোনো একটা এক্সিট রোড দিয়ে শহরের বাইরে কোথাও চলে যাওয়ার জন্য, যেন তারা জনবহুল রাস্তা এড়াতে পারে। কিছুদূর এগিয়েই চালক প্রশ্ন করলো, "আপনারা এখন কোথায় যাবেন?" জামিল একবার শিরিনের দিকে তাকিয়ে বললো, "নিরাপদ কোথাও। একটা বদমাশ লোক আমাদের পিছু নিয়েছে, প্লিস, দ্রুত দূরে নিরাপদ কোথাও আমাদেরকে নিয়ে যান।" চালক মাথা নেড়ে চালাতে লাগলো। যতো তারা দূরে গেলো, শহরের কোলাহল ততোই কমে গেলো। জামিল আর শিরিন জানালা দিয়ে সতর্কতার সাথে চারপাশ দেখে যাচ্ছিলো।

প্রায় ৩০ মিনিট চলার পর অবশেষে, তারা শহরের এক নিরিবিলি অংশে এসে পৌঁছালো। চালক গাড়ি থামালো একটি ছোটো গেস্ট হাউসের সামনে।

ছয়.

গেস্ট হাউসটি ছিলো সাধারণ, কিন্তু দরজার সামনে ছোটো ছোটো গাছের টব দিয়ে সাজানো ছিলো। জামিল দরজায় নক করলে এক মধ্যবয়সি মহিলা দরজা খুললেন। তিনি ট্যাক্সি চালকের সাথে স্থানীয় ভাষায় কিছু কথাবার্তা বললেন, তারপর জামিলদের দিকে মৃদু হাসি দিয়ে

ঝরঝরে ইংরেজিতে বললেন, "আপনারা এখানে থাকতে পারেন, আজ রাতে। নিরাপদে থাকবেন।" মহিলার কথায় যেন জামিল প্রাণ ফিরে পেলো। সে দ্রুত ট্যাক্সি চালকের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে শিরিন আর শান্তকে নিয়ে গেস্ট হাউসের ভিতর চলে গেলো। তাদের দেওয়া ছোটো রুমটি যদিও খুব বিলাসবহুল সামগ্রীতে সুসজ্জিত ছিলো না, তবে পরিচ্ছন্ন এবং নিরাপদ ছিলো, যা কিনা এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতক্ষণে ক্লান্ত শান্ত তার মায়ের কোলে ঘুমিয়ে গেছে।

মাঝরাত পর্যন্ত জামিল এবং শিরিন রুমের ভেতর শুধু পায়চারি করছিলো। রাত দশটার দিকে গেস্ট হাউসের সেই ভদ্রমহিলা এসে কিছু খাবার দিয়ে গেছে। কিন্তু সেগুলো টেবিলেই পড়ে আছে। শিরিন একটু পরপর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে, কোনো গাড়ির আলো জানালায় এসে পড়লেই বুকের ভেতরটা ধপ করে উঠছে তার।

"আমাদের ব্যাংকক ছেড়ে যেতে হবে" জামিল ফিসফিস করে বললো- "ভোরের ফ্লাইট ধরে ঢাকা ফিরে যেতে হবে"। শিরিন ভাঙ্গা কণ্ঠে বললো, "কিন্তু বিমানবন্দরে যদি ওরা থাকে?" "আমরা ভোরের আগেই যাবো" জামিল উত্তর দিলো।

সাত.

ভোরের আলো ফোটার আগেই তারা চুপচাপ জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলো। শিরিন শান্তকে কোলে নিলো আর জামিলের হাতে তাদের লাগেজ। গেস্ট হাউসের মালিক ভদ্রমহিলা আগেই একটি ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে রেখেছিল বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য। এয়ারপোর্ট আসা পর্যন্ত পথটি ট্যাক্সির ভেতরে তাদের অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে কাটছিলো।

এয়ারপোর্টে পৌঁছেই তারা দ্রুত সিকিউরিটি চেকইন করে চলে গেলো টিকেট কাউন্টারে। টিকেট কাউন্টারের লোকটিকে ঘটনার বিস্তারিত বলে দ্রুত সময়ের মধ্যে টিকেট পরিবর্তন করে পরবর্তী ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস নিয়ে নিলো। এমন সময় জামিলের হঠাৎ মনে হলো শিরিন ও শান্ত তার সাথে নেই! মুহূর্তেই এদিক ওদিক তাকিয়ে জোরে চিৎকার করে উঠলো জামিল, "শিরিন! শান্ত!" কিন্তু কাউকেই দেখা গেলো না।

"কী হয়েছে তোমার? এমন করছো কেনো?" - শিরিনের হাতের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেলো জামিলের। আরে! এ তো স্বপ্ন! ঘরের মধ্যে চারপাশে দেখতে লাগলো জামিল, চারদিকে অন্ধকার, তার পাশেই ঘুমিয়ে আছে শান্ত। জানালার দিকে তাকালো সে, ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে।

*****

নিরন্তর চাওয়া

মো. গোলাম মাওলা
প্রাক্তন প্রজেক্ট ম্যানেজার
নিউজেন টেকনোলজি লিমিটেড

ছোঁবো মুখখানি তোমার, জড়িয়ে বুকে অহর্নিশ
সহস্র ধরনে, সহস্র যুগ ব্যাপিয়া।
তুমিই আমার চাওয়া, তাইতো
কত করে খুঁজেছি তোমায়।

নিকষ কালো আঁধারে, কত নির্জন রাত্রি জাগ্রত নয়নে,
ওই রাতের আকাশ জুড়ে গুমোট করা মেঘগুলোর আড়ালে,
মিটমিট করা নীল তারার আলোর বিন্দুতে,
কত করে খুঁজেছি তোমায়।
ভোরের প্রকৃতির সৌন্দর্য বিচ্ছুরণে,
শরতের নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘপুঞ্জে,
কত করে খুঁজেছি তোমায়...
জ্যোৎস্নারাতে এ ধরাতলে চুইয়ে নামা পূর্ণ চাঁদের দ্যুতিতে,
বৃষ্টিস্নাত বিকেলে ওই সাতরঙা রংধনুতে।

*****

জীবনযুদ্ধে বিজয়িনী

বদিউল আলম
সিনিয়র অফিসার, সেন্ট্রাল স্টোর
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

প্রতিদিন ভোরে এক ঝাঁক যোদ্ধা দল বেঁধে যখন পথে নামে
মনে হয় পথেরা জেগে উঠে কুর্নিশ করে নতশিরে।
পায়ের আওয়াজে তাদের ঝংকার তোলে পিচঢালা নিস্তব্ধ পথ
চোখে স্বপ্ন, বুকে বল নিয়ে হেঁটে চলার কী ক্ষিপ্র গতি!
চারপাশের ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে একেকজন লড়াকু সৈনিক।

কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ, ভেতরে খাবারের একটি প্ল্যাস্টিকের বাটি-
সেখানে ক্ষুধা নিবারণের জন্য অতি সাধারণ মানের কিছু রসদ।
সাথে কোনো অস্ত্র নেই, দুটি পা ও হাতের দশটি আঙুলের উপর ভর করে যার যার অবস্থান থেকে সারিবদ্ধভাবে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সারাদিন সুঁই-সুতার সাথে সুনিপুণ যুদ্ধ শেষে ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফেরার তাড়া,
কারো ঘরে ছোট্ট শিশু, অক্ষম স্বামী অথবা বৃদ্ধ বাবা-মা পথপানে চেয়ে থাকে।
ফিরতি পথে বাজার করে তারপর রান্না-বান্না, আরো কত কাজ পড়ে আছে!
অবসাদগ্রস্ত পা'দুটো আরো দ্রুত হয়, যেন দৌড়ে চলে সময়কে পিছে ফেলে,
সংসার নামক রণাঙ্গনে আবার লড়তে হবে, থেমে যাওয়ার সময় নেই।

সবশেষে দিনের সকল ক্লান্তি, অবসাদ ও কষ্টগুলো রাতের গাঢ় আঁধারে মিলিয়ে যায়,
নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে যারা দেশকে সমৃদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত-
তাদের তরে আমার শত প্রণাম, শতকোটি ভক্তি ভালোবাসা;
তারা মোদের কন্যা-জায়া-জননী, হার না মানা জীবনযুদ্ধে বিজয়িনী।

*****

ফটো অ্যালবাম

ব্যাবিলন কথকতার ১৮তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনী উৎসবের বিশেষ ক্ষণে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট লেখক ও ব্যাংকার, জনাব মাসরুর আরেফিনের সাথে পত্রিকার কলাকুশলী, এবং গ্রুপের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তির ১০ম ব্যাচে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণের সাথে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ড. সলিমুল্লাহ খান, অতিথিবৃন্দ, ব্যাবিলন গ্রুপের পরিচালক মহোদয়েরা এবং উর্ধ্বতন কমকর্তাগণ।

বার্ষিক ব্যাবসায়িক পরিকল্পনা-২০২৪ এবং দলগত দক্ষতা বৃদ্ধির অধিবেশনে ব্যাবিলন গ্রুপের নেতৃত্ব প্রদানকারী দলের একাংশ একই ফ্রেমে বন্দি হবার বিশেষ মুহূর্ত (জানুয়ারি, ২০২৪)।

গত জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্রজনতার আন্দোলনে আহতদের পাশে আমরা ব্যাবিলন (২০২৪)।

২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কুমিল্লা-লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের গৃহহীনদের জন্য ব্যাবিলন পরিবারের ছোট্ট সহায়তা।

ব্যাবিলন গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রতি বছর দেশের শীতপ্রধান অঞ্চলসমূহে শীতবস্ত্র বিতরণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উত্তরবঙ্গের শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় (ডিসেম্বর, ২০২৩)।

BABYLON RESOURCES NEWGEN

Product:

- Event by
- Foodi POS
- Document Management system
- Accounting Management System
- Training Monitoring system

B2B

- HR and Payroll Management System
- Sales & Care
- Production Management System
- Inventory Management System
- Babylon Payment Automation System (BPAS)
- LC Management System (LCM)
- Cash Incentive Management System

Skill Shoper

Soft Skills Training

1. Soft Skills for 21st Century- Industry 4.0 & Future of Work
2. Personal Development Planning
3. Effective Communications Skills
4. Effective Presentation Skills
5. Time Management
6. Team Building, Collaboration & Team Work
7. Professional Manners & Etiquette at Workplace
8. Negotiation Skills
9. Leadership Skills
10. Effective personal branding

B2G

- Software Development
- Apps & Games Development
- Human Resource Development

Training

- Database
- Cyber Security
- Programming
- Networking
- Digital Marketing
- Graphics Design
- Professional Web Development
- Data Science and Machine learning
- WordPress Theme Customization

Floor–7A, House 3/1, Block F, Lalmatia,Mohammadpur, Dhaka 1207
+88 (02) 9015165, 9015348, +8809609003306 www.brlbd.com www.newgen-bd.com

BABYLON TRIMS LIMITED

(A Concern of Babylon Group)

Our Products:

- Auto Carton Box
- Manual Carton Box
- Top Divider
- Honeycomb
- Poly Bag (Side & Bottom Sealing)
- Recycle Poly Bag
- Zip Lock Poly Bag
- Roll Poly
- Gum Tape
- Back Board
- Neck Board
- Plastic Clip
- Collar Insert
- Butterfly
- Tie Band
- Photo Inlay
- Hang Tag
- Price Ticket
- Photo Box
- E-Flute Box
- Cascade
- Wrap Band
- Barcode Sticker
- Carton Sticker
- Size Sticker
- Tissue Paper
- Printed Label

Compliance & Other Certifications

- Gold certified of compliance by WRAP
- Amfori BSCI
- OEKO-TEX certified
- FEM certified
- FSC certified
- GRS certified
- RCS certified
- Sedex certified
- SLCP certified
- 90 Day's monitoring reports of Alliance
- PEFC (We are the first certified facility in BD)

Office & Factory :
Kandi Boilarpur, Horindhara
Hemayetpur, Savar
Dhaka-1340, Bangladesh.
Cell: +8801886-230366
E-mail: arifrazzaque@babylon-bd.com

Marketing Office :
House-28 (1st Floor)
Road-6/B, Sector-12, Uttara
Dhaka, Bangladesh.
Cell: +8801714-206566
E-mail: shakilbtl@babylon-bd.com

Corporate Office :
2-B/1, Darussalam Road, Mirpur
Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel: 9023495-6, 9025495, 9023460,
9023462-63, 9007175,9010533, 8011089
Fax: 880-2-8015128

Web: www.babylongroup.com

Corporate Office:
2-B/1, Darussalam Road, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel : +880960900300
E-mail : babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com
: www.babylonkathokata.com